হায়েস্ট ! দেখছিস্ আমি গোলাম পেরে লীড দিলাম, দশ আমার কাছে না থাকলে দিই ! তুই সাহেব মারলে এক পিঠ পেতো ওরা শুধু ওই টেক্কার, নাও, এবার ছ'পিঠ টেনে নেবে। ব্রীজ খেলা অত সোজা নারে। বড়ো কঠিন ! বড়ো শক্ত এই ব্রিজ খেলা, বিলেতে মেয়েদের তাই খেলতে বারণ আছে ! এমনি সব কথা লেগেই আছে রাঙাদার মুখে সর্ব্বদা।

তিনটে হবে তখন এমনি সময় মেজ বৌদি এসে শীলার দুই গাল দুই হাত দিয়ে চেপে ধ'রে আস্তে ওর মাথা নাড়িয়ে দিয়ে ওর ঘুম ভাঙ্গালেন। ও চাইলো, বিস্মিত চোখ মেলে পাংশু মুখে ও চাইলো। ব্যাপারটা বুঝে নিতে ওর খানিকটা সময় লাগলো।

দুই হাত দিয়ে চোখ রগ্‌ড়ে নিয়ে ও মেজ বৌদিকে প্রশ্ন ক'রলো,—কী ?

খুকুমণি, ওঠো ! লিলুদি ওঠো ! চোখ মেলে চাও তো একবার।

শীলা এবারে উঠে ব'সলো এবং সম্মুখে টেবিলের দিকে চেয়ে দেখলো টাইমপিস্‌টার ছোট কাঁটা তিনের ঘরে এসে গেছে।

—সুনীল বাবু এসেছেন, ও-ঘরে বড়দির সাথে কথা ব'লছেন, যাও ! দেখা ক'রবে না ? না কর তো, বরং আরেকটু ঘুমিয়ে নাও, মোটেতো এখন তিনটে ! মেজবৌদি মুচকি হেসে ব'ললেন, দুই ঠোঁটের ফাঁকে সারিবদ্ধ কতকগুলি দাঁত ঝলমল ক'রে উঠ্‌লো।

শীলা কোন কথা ব'ললো না, বিছানা থেকে মাটীতে পা দিলো।

হ্যাঁ সুনীল বাবুর পাংচুয়ালিটি প্রশংসাণীয় বটে !

কলতলায় গিয়ে ও চোখ-মুখ বেশ ক'রে ধুয়ে নিলো। তারপর দুই হাত দিয়ে ছড়ানো-ছিটানো চুলগুলি টান করে নিলো। শাড়ী দিয়ে নিজেকে একটু বেশী আবৃত ক'রে নিলো। নিয়ে, ও বড়বৌদির সঙ্গে গল্প ক'রছে।

—এই যে আসুন ! সুনীল হাত দুটি কপালে ছোঁয়ালো।

প্রতি নমস্কার ক'রে শীলা বড়বৌদির খাটের উপরে গিয়ে ব'সে প্রশ্ন ক'রলো,—কখন এলেন ?

—এই কিছুটা আগে, পনোরো কুড়ি মিনিট হবে, সুনীল ব'ললো,—আপনিও খুব ঘুমিয়েছেন দেখছি, দুপুরে ঘুমোন নাকি ?

বড়বৌদি ফোরণ দিয়ে উঠলেন,—না, ঘুমোন-না আবার। রোজই তো তুই ঘুমোস্। পরে সুনীলকে উদ্দেশ ক'রে,—ঘুমের রাজা ভাই ও। যখন ঘুমোতে বলো স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে প'ড়বে। যেমন প'ড়তেও ক্লান্তি নেই তেমনি ঘুমেও নেই এতটুকু অবসাদ বা অরুচি।

সুনীল দুজনের মুখের দিকে তাকালো আমোদের সাথে।

শীলা অল্প একটু হেসে কেমন ক'রে চাইলো বড় বৌদির দিকে, অর্থাৎ আপনি আমাকে আশ্চর্য্যকর ভাবে study ক'রেছেন দেখছি।

খাটের উপরে খুকু দুই হাত ও দুই-পা সম্পূর্ণ প্রসারিত ক'রে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলো। শীলা চট্ ক'রে ওকে টেনে তুলে কোলে নিলো। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় মেয়েটি কেঁদে উঠ্‌লো। বড় বৌদি ব'ললেন,—কাঁচা ঘুম ভাঙ্গালি তো! এখন থামাও তুমি ওকে! আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই।

শীলা ওকে কোলে নিয়ে নীচে নেমে পায়চারী ক'রতে লাগলো। ওকে কাঁধের'পরে নিয়ে আস্তে আস্তে নিজের শরীর দোলালো। কিন্তু খুকু তবুও থামলো না।

লজ্জিত ভাবে বড় বৌদির কোলে ওকে দিয়ে শীলা ব'ললো,—হ'লোনা বৌদি। মেয়েটি বড় বদ্ হ'য়ে গেছে।

মেয়ের গালে সশব্দে চুম্বন ক'রে ছেলে মানুষের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে প্রতিমা ব'ললো,—বদ্ হয়েছে বৈ কি? আমার এমন পরীর মতো মেয়ে খুকুমণি—সে হবে বদ্? তুমি ওর এমন মিষ্টি ঘুম নষ্ট ক'রে দিলে আর দোষ হবে ওর।

প্রতিমা মেয়েকে কোলে নিয়ে উঠে প'ড়ে ব'ললেন,—যাই দুধ খাইয়ে আসি, নইলে থামবে না।

কিছুটা গিয়ে ফিরে এসে সুনীলকে উদ্দেশ ক'রে আবার,—চা না খেয়ে পালিয়ে যেয়ো না ভাই। আমি আসচি। (পরে শীলাকে সম্বোধন ক'রে) তুই ততক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প কর।

শীলা ঘাড় কাৎ ক'রলো। কিছুটা পরে ব'ললো,—কোথায় ছিলেন এতদিন আপনি?

–কেন,—এখানেই, ক'লকাতায়ই! সুনীল ব'ললো।

—এতদিন দেখিনি।

–আসতাম না এমনি। কতগুলো দরকারী কাজে ভয়ানক ভাবে জড়িত হ'য়ে প'ড়েছিলাম। তারপর চুপ ক'রে গেলো। চোখ থেকে চশমা বের ক'রে রুমাল দিয়ে পুঁছে নিয়ে ব'ললো,—এখানে একটা সিগারেট খেতে পারি কি?

শীলা হালকা হেসে ব'ললো, স্বচ্ছন্দে!

—সুষমার কাছে গিয়েছিলেন শুনলাম,। শীলা যেন নীরবতা সহ্য ক'রতে না-পেরেই অনাবশ্যক এই প্রশ্ন ক'রলে!

—হ্যাঁ, ! একমুখ নীলচে ধোঁয়া মুখ দিয়ে বের ক'রে সুনীল ব'ললে,—হ্যাঁ, কাল গিয়েছিলাম।

—ওর সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কী ?

—কী আর ভাববো ! মানুষের জীবনে এমন শোচনীয় দুর্ঘটনাও হয়। প্রকাশের জন্য ভয়ানক কষ্ট পেয়েচি সত্যি ; এমনকি একদিন কেঁদে ফেলেছিলাম এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ! কিন্তু এখন আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে ওর ওপর। কী অধিকার ছিলো ওর সুষমার জীবনকে এ-রকম ওলট-পালট করে দেওয়ার ? টাকা,—পৃথিবীতে টাকার প্রয়োজনই কি সবচে বেশী ? দেখলাম ও চিঠি,—সুষমাকে যে চিঠি লিখে রেখে গেছে। ভেবেছে—

—যাক্ কী দরকার ওসব অপ্রিয় আলোচনায়, বাধা দিয়ে শীলা ব'ললে।

—দরকার নেই ? পাশের জানলা দিয়ে সিগরেট ছুঁড়ে ফেলে সুনীল ব'ললে,—কী অমানুষ ভাবুন দেখি একবার ? অথচ ছেলে বেলায় অন্যায় ক'রলে মা কতবার ব'লেচেন, প্রকাশ, প্রকাশকে দেখতো—তোরই তো বন্ধু। কেমন শান্ত আর মিষ্টি ছেলে ? ওর মতন হ'তে পারিস্ না ? সুনীল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো। হয়তো মনের মধ্যে ছোটবেলাকার প্রকাশকে খানিক দেখে নিলো। আবার ব'লতে লাগলো,—আপনি জানেন না, মিস্ মিত্র, আপনি জানেন না আমাদের মধ্যে কী গভীর ভালবাসা ছিল।

সুনীল থামলে শীলা ব'ললো,—আমাদের সবারি মনে হয় সুষমার এখন বিয়ে হওয়া উচিত। এখন, মানে পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলে অবিশ্যি ! আপনি কী বলেন ?

—নিশ্চয়ই, বিয়ে না ক'রলে কী ক'রে চ'লবে ?

—হ্যাঁ, সেই কথাই ! কয়েক সেকেণ্ড থেমে শীলা স্পষ্টই প্রস্তাব ক'রলো,—আপনিই ওকে বিয়ে করুন না সুনীলবাবু ! দুজনেই হয়তো সুখী হবেন।

সুনীল চমকে উঠলো। শীলার কথাটা বোধ হয় বিশ্বাস ক'রতে কষ্ট হ'লো। সোজা হ'য়ে ব'সে ব'ললো,—আমি ?

—হ্যাঁ।

—আমি কি ক'রে ক'রবো ? আর ওই-বা আমাকে বিয়ে ক'রতে চাইবে কেন ? আমার কী আছে বলুন যে সুষমাকে আমি কামনা ক'রতে পারি ?

—কিছুই থাকতে হবে না সুনীল বাবু। আপনি আপনিই, এই সত্যটা আমার মনে হয়, সুষমার কাছে বেশী লোভনীয় হবে।

সুনীল চালাক ছেলে। অত্যন্ত সরল ভাবে ব'ললো,—তা হ'লে আমাকে একটু ভাবালেন দেখচি। আমি কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনি,—মানে, আমার স্ট্রাইকই করেনি।

—ভাববেন, শীলা তার কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য গুরুত্ব এনে ব'ললে,—কথাটা একটু বিশেষ ক'রে ভেবে দেখবেন। নইলে, এখন ওর অবস্থা হবে অসহ্য। একজন অভিভাবক তো দরকার।

ঘড়িটা কথা ব'লে উঠ্‌লো।

—এঃ! পাঁচটা বেজে গেল! সুনীল চেয়ারে একটু ন'ড়ে ব'সে ব'ললো,—এবার উঠ্‌তে হয়। শীলা চৌকী থেকে উঠে প'ড়ে দরোজার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে ব'ললো সুনীলকে,—বৌদি বড় দেরী ক'রছেন। দেখি আপনার চা নিয়ে আসি।

—আসুন, বসছি। সুনীল টেবিলের ওপর থেকে বাঁ-হাত দিয়ে একটা সচিত্র ম্যাগাজিন টেনে নিলে।

(ক্রমশ)

"মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না, তখন কেহ বা বাংলার মিল্‌টন্‌, কেহ বা বাংলার বায়রন, কেহ বা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—এমন কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক বলিলে আমাদের আশ মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারো সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা ;—কারণ, গ্যারিক যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মান্তর যাপন করিতেছিল।"
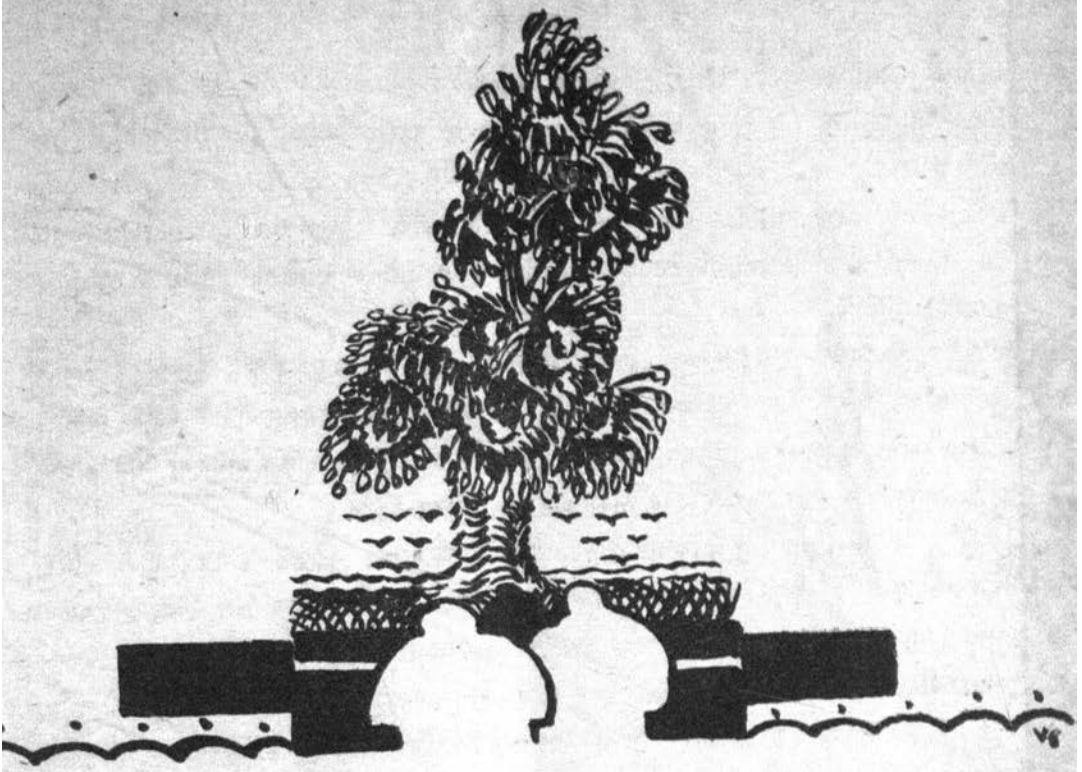
—রবীন্দ্রনাথ

কলা-ভবন

চিত্রলিপি*

বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নিজের ছবির পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়াছিলেন—"যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আনত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু, সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই।" 'চিত্রলিপি'র ভূমিকাতেও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাঁহা প্রণিধানযোগ্য : "People often ask me about the meaning of my pictures. I remain silent even

* "Chitralipi" by Rabindra Nath Tagore; Visva-Bharati Book Shop, 210, Cornwallis Street, Calcutta. Price Rs. 4-8 and Rs. 10|-.

as my pictures are. It is for them to *express* and not to *explain.* They have nothing ulterior behind their own appearance for the thoughts to explore and words to describe and if that appearance carriês its ultimate worth then they remain, otherwise they are rejected and forgotten even though they may have some scientific truth or ethical justification."

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ কোন্ 'আঙ্গিকে' ছবি আঁকিয়াছেন বা তাঁহার ছবিগুলি কোন্ স্কুলের এসব কথা তুলিবার প্রয়োজন হয় না। চিত্র-সমালোচনার কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার সাহায্যে তাঁহার ছবির সমালোচনা করা ভুল। নিছক বুদ্ধির সাহায্যে যিনি তাঁহার ছবির দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাকে হতাশ হইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকিবার প্রথম প্রচেষ্টা অনেকের কাছেই কবির খেয়াল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। হয়ত তাহার ছবি আঁকিবার পিছনে কোন খেয়াল ছিল, কিন্তু সে খেয়াল কবির খেয়াল নয়, তাহা তাঁহারই অন্তরবাসীর খেয়াল—অবচেতনার রাজ্য লইয়া যাহার খেলা। অবচেতনার রাজ্যের উপর আমরা চেতনার রাজ্যের একটি বিরাট বোঝা চাপাইয়া রাখি, তাই অর্দ্ধ-আলোকিত অবচেতনার রাজ্যে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্ত্তন চলিতেছে তাহার কোন আভাসই আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছায় না। চেতনার রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে ছুটি না লইতে পারিলে অবচেতনার রাজ্যে আমরা প্রবেশ করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ এই রকম ছুটি লইয়াছিলেন, তাই অবচেতনার রাজ্যের এই ছবিগুলি ধরিয়া আনিতে পারিয়াছেন। দৃশ্যমান জগতের মাপকাঠির সাহায্যে এই ছবিগুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে যাওয়া বৃথা। ইহাদের দিকে চাহিলে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি মনে পড়ে :

"আপন প্রকাশ আপনাতে
নিয়ে সার্থে নিজে দাও দেখা, বচনের মল্লিনাথে
ভ্রূক্ষেপ করনা কভু।"

সুন্দরের প্রকাশ নানা রূপে, নানা ছন্দে। রঙে ও রেখায় মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া সুন্দরকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানুষের এই প্রচেষ্টার ফলে কত অভিনব জিনিষ সৃষ্টি হইয়াছে সে কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু শিল্প-জগত যত বিচিত্রই হউক্ না কেন তাহা একটি কথাই মনে করাইয়া দেয়,—"চিত্রকর গান করে না, ধর্ম কথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে—'অয়ম্ অহম্ ভো'—'এই যে আমি এই'।" 'চিত্রলিপি'র প্রতিটি

একটি লোক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ছবিও এই কথাই বলে। ইহাদিগকে কবির খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন!

ছবির দিক হইতে যদিও রবীন্দ্রনাথকে কাহারও সহিত তুলনা করা চলে না, তবুও রবীন্দ্রনাথের ছবি আর দুই জনের ছবির কথা মনে করাইয়া দেয়। তাঁহাদের এক জন উইলিয়াম ব্লেক্ এবং আর এক জন ভিক্টর হিউগো। দুই জনই কবি এবং দুই জনেরই আনাগোনা ছিল অবচেতনার রাজ্যে। যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য মানুষকে এবং তাহার জগতকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, সেই রহস্য তাঁহাদিগকে বারে বারে আত্মবিস্মৃত করাইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহারা রেখায় ও ছন্দে যে ভাব বা রূপ ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাকে কথায় ব্যক্ত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলে চলে।

রবীন্দ্রনাথ হয়ত আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাঁহার ছবি হইতে অনেকেই নানা বাজে অর্থ খুঁজিবার চেষ্টা করিবেন, তাই তিনি আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন, এরকম চেষ্টা যেন কেহ না করেন। বস্তুত ছবি হইতে নানা অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা অর্থহীন; তাহাতে আর যাহাই হোক্ রসোপলব্ধির আনন্দ লাভ করা যায় না। অথচ ছবি দেখার ব্যাপারে এই আনন্দই একমাত্র সত্য। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিজের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—"পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানা কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান।" চিত্রকর হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এ দায়িত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন, 'চিত্রলিপি'র ছবিগুলি ভাল করিয়া দেখিলে একথা অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করা যায়, বলা যায় কোথা হইতে আরম্ভ করিয়া কোথায় আসিয়া সে প্রতিভা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার শিল্প-প্রতিভার কোথায় আরম্ভ বা কোথায় পরিণতি তাহা বলা যায় না। আমরা যে ছবিগুলি দেখিতেছি তাহাদের সবগুলিই পরিণত হাতের আঁকা। শিক্ষানবীশের অসম্পূর্ণতা বা অসঙ্গতি কোথাও নাই। এখানে একথা মনে রাখা দরকার যে তিনি বাস্তবের প্রতিলিপি আঁকিতে চান নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন:

"টুক্‌রো যত রূপের রেখা
　　সঞ্চিত রয় মনের চিত্রশালে,
কখন ছবির আকার নিয়ে
　　জোড়া লাগায় শিল্পকলার জালে॥" (প্লেট ১৬)

এই 'মনের চিত্রশালে' সঞ্চিত 'টুক্‌রো রূপের রেখা'গুলি তিনি নিপুণ শিল্পীর মতই আঁকিয়াছেন। তাঁহার তুলিকায় প্রতিটি রেখা জীবন্ত ও ছন্দময় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার

অঙ্কনরীতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। নিছক রেখার সাহায্যে যে ছবিগুলি আঁকিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ৪ ও ৮ সংখ্যক প্লেট দুইখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সঙ্গীতে হার্ম্মনি বলিয়া একটি কথা আছে। বিভিন্ন সুরের সংমিশ্রণে হার্ম্মনির সৃষ্টি, অথচ প্রতিটি সুরের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এই সংমিশ্রণে ব্যাহত হয় না। উক্ত প্লেট দুইখানির দিকে ভাল করিয়া চাহিলে বিভিন্ন রেখার মিলনে অপূর্ব্ব একটি হার্ম্মনি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা উপলব্ধি করা যায়, তাই বলিয়া রেখাগুলির নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য এতটুকু নষ্ট হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের রঙের ব্যবহারও কম বিস্ময়জনক নয়। বর্ত্তমান যুগে এদেশের চিত্রকরদের আঁকা ছবিতে রঙের বিচিত্র-খেলা দেখা যায় না। মনে হয় রঙের কাজ যেন গৌণ, মুখ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরিয়া বিশ্বব্যাপী রঙের খেলা দেখিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ছবির রঙের একটি অনির্ব্বচনীয় সৌষ্ঠব নজরে পড়ে। তাঁহার অধিকাংশ ছবি, বিশেষ করিয়া ৩ ও ১৬ সংখ্যক প্লেট দুইখানিতে তিনি যে রঙের ব্যবহার দেখাইয়াছেন, তাহা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার ছবিগুলির দিকে চাহিলে তাঁহারই গান মনে আসে ঃ

"তোর পরাণে কোন্ পরশমণির খেলা।
তাই হৃদ্‌গগনে সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাইতো পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,
কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ ॥"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেমন ছবিতেও তেমনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব-প্রসারের ইঙ্গিত রহিয়াছে। তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে বিরাট বিশ্বের মাঝে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে নিজের ব্যক্তিত্বকে সকল বন্ধন সকল সংকীর্ণতার গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া চারিদিকে প্রসারিত করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রসারের সাধনা। কি কাব্যে কি চিত্রকলায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার সৃষ্টির মূলে ছিল এই সাধনা, আর এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তিনি জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে নানা বিচিত্র পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার শিল্প সাধনাকে ব্যক্তিত্ব-প্রসারের সাধনা হইতে পৃথক করিয়া দেখা চলে না।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ছবিগুলি যদিও তাঁহারই আঁকা

তবুও কোন ছবির মধ্যে তিনি নিজে একান্তভাবে আবদ্ধ হন নাই, তাঁহার স্বাভাবিক গতি তাঁহাকে সামনে লইয়া গিয়াছে। 'চিত্রলিপি'র আঠারখানি ছবির দিকে চাহিলে একথা মনে না আসিয়া পারে না যে, যিনি ছবিগুলি আঁকিয়াছেন তাঁহাকে এই ছবিগুলির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। ইহার কারণ তাঁহার বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। মনে হয় পান্থশালার দ্বারের সামনে যেন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়াছেন এবং ভিতরের দিকে খানিকটা চাহিয়াই আবার নিজের পথে চলিয়াছেন। তাহার ছবিগুলি এইরূপ ক্ষণিকের দৃষ্টির সমষ্টি। তাঁহার ছবিগুলির দিকে চাহিয়া বারে বারে এই কয়টি লাইন মনে পড়িতেছে :

"Back I cast a look,
And lingered near the door a little space,
Then sought with quiet heart my distant home."

"আমাদের আমবাগানে আজকাল আম ফলে না, বিলাতের আপেল বাগানে প্রচুর আপেল ফলিয়া থাকে। আমরা কি তাই বলিয়া মনে করিব যে, আমগাছগুলা কাটিয়া ফেলিয়া আপেলগাছ রোপন করিলে তবেই আমরা আশানুরূপ ফললাভ করিব ?"

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-নাটক

কণাদ গুপ্ত

[নীচের প্রবন্ধটী সমালোচনা নয়। রবীন্দ্রনাথ অতি সম্প্রতি ইহলোক থেকে ছুটী নিয়েছেন, হাত দিলে তাঁর ঘরের ধূলিতে এখনও হয়তো তাঁর অঙ্গের উত্তাপ মিলতে পারে। এ সময় সমালোচনা চলে না, উচিত নয়, সম্ভব নয়, কারণ নিরপেক্ষ সমালোচনার অর্থ শুধু ভাবকে ধরিয়ে দেওয়াই নয়, অভাবকে দেখিয়ে দেওয়াও। কিন্তু মনুষ্যসমাজে প্রথা আছে কোনও বিরাট প্রতিভার তিরোভাব ঘটলে তাঁকে উপেক্ষা না করা, তাঁর বিয়োগে সমাজ কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হল, তার পরিমাপ করা। এ প্রবন্ধ তেমনি এক উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা, সমালোচনার উদ্দেশ্যে নয়।]

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যের অবস্থা ছিল কতকটা আফ্রিকা মহাদেশের কোনও অনাবিষ্কৃত জঙ্গলের ন্যায়। জঙ্গলের উপরে ও অন্তরে প্রচুর ধন আছে, প্রচুর খাদ্য আছে; এত আছে যে, একটা বিলাসী জাতি পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া কাটাইতে পারে। কিন্তু এই বিপুল ধন ভাণ্ডার কাজে লাগায় এমন মানুষ নাই। ভাল পায়ে-চলা একটী পথও কেহ বানাইয়া রাখে নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা স্থূল অস্ত্রের সাহায্যে কাজ চালাইবার মত যে দু'একটী গতায়াতের পথ সৃষ্টি করিয়াছে, সভ্য মানুষের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। কদাচিৎ দু'একজন সভ্য বৈজ্ঞানিকের পদার্পণও সেখানে ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারাও তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। এমন সময় আবির্ভাব হইল রবীন্দ্রনাথের। তাঁহার এক হাতে উজ্জ্বল মশাল, অপর হাতে ধারাল অস্ত্র। ক্ষিপ্র হস্তে তিনি জঙ্গল সাফ করিলেন, উজ্জ্বল মশালালোকে আঁধার বনপ্রদেশ আলোকিত করিলেন, বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য বহু নূতন পথ সৃষ্টি করিলেন! এক পথ গেল লিরিক কবিতারূপ স্বর্ণখনির দিকে, আর এক পথ গেল সাইকলজিকাল উপন্যাসরূপ শস্যক্ষেত্রের দিকে, তৃতীয় পথ মিশিল ভাবগর্ভ নাটকরূপ গভীর নীলনদের বুকে—এমনি আরও কত পথ। এই সকল পথ বাহিয়া তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাহিত্যের ধন ভাণ্ডারে প্রবেশ করিল, ভাণ্ডার লুটিয়া লইল, দেশ ধন্য হইল; লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ক্ষেত্র অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহাও মানুষের কাজে আসিয়া ধন্য হইয়া গেল।

বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাংলা দেশের নাটক যে পথে চলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথ

নিজের জন্য তাহা হইতে সম্পূর্ণ একটী ভিন্ন পথ বাছিয়া লন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে নাট্যকার-দিগের রীতি ছিল ইতিহাস বা পুরাণ হইতে কোন চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সংলাপের দ্বারা দৃঢ় করা, অথবা, আমাদের আশে পাশে সংসার ও সমাজে যে সকল ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে, তাহারই কোন একটীকে বাছিয়া লইয়া সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করিয়া নাটকের রূপ দেওয়া; এই সকল ঘটনা বর্ণিত হইবার অবকাশে যে সকল চরিত্র ফুটিয়া উঠিবার জন্য সংগ্রাম করিত, তাহাদেরই সার্থকতায় সার্থক হইত নাট্যকারদিগের শিল্পী-প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ বেশীর ভাগ নাটকে এই রীতি অনুসরণ করেন নাই। বাহিরের জগতের উপর তাঁহার আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট—এ কথা সহস্র কবিতায় লক্ষ বার তিনি বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে আকর্ষণ তাঁহার কবি-প্রতিভা হইতে স্বতন্ত্র নহে, বিচ্ছিন্ন নহে, বরং সেই প্রতিভারই অংশ বিশেষ। তাই বাহিরের জগৎ ও বাহিরের জীবনকে তিনি আমাদের নয়ন দিয়া দেখিতেন না, দেখিতেন তাঁহার প্রতিভার নিকট হইতে পাওয়া দিব্য নয়ন দিয়া। তিনি কবি, তাঁহার ছিল নিজের একটী স্বতন্ত্র ভাবলোক। কবি-সুলভ সহজ বুদ্ধির দ্বারা তিনি এই ভাবলোকে অনেক সময় অনেক সত্যের সন্ধান পাইতেন। এ সকল সত্য তাঁহার কাছে বাহিরের জীবনের ঠেকা-খাওয়া অভিজ্ঞতার ফল হইয়া আসিত না, দুর্লভ অনুপ্রেরণার মুহূর্ত্তে কবির সহজ চেতনার কাছে আপনা হইতে নিজেদের ধরা দিত। তখন কবি বাহির হইতেন মানুষের জগতে, যোগ্য ঘটনা পাইলেই নাট্যাকারে বাঁধিয়া ভাবলোকে উপলব্ধ সেই সকল গভীর সত্যকে অমর করিয়া রাখিতেন!

এই জন্যই কবির অধিকাংশ নাটক রূপক, বিশেষ করিয়া তাসের দেশ, ডাকঘর, মুক্তাধারা, রক্তকরবী, অচলায়তন প্রভৃতি শেষের দিকের নাটকগুলি। প্রথম দিকের নাটকগুলি—প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, মালিনী, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি—ঠিক রূপক না হইলেও, তাহাদের কাহিনী মর্ম্মে কবির দৃষ্টির নিকট প্রতিভাত কোনও উচ্চ সত্যকে বহন করে।

'চিত্রাঙ্গদা'র সূচনায় কবি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় তাঁহার নাটক লেখার প্রেরণা আসিত কোন পথে :

"অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগুনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গনে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরু প্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রস-

সঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতীন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র শক্তি থাকে, তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয় যাত্রার সহায়। সেই দানই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধুলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই, এই চরিত্র-শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী।"

কিন্তু পূর্ব্বে উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া নাটকের চরিত্রগুলিতে মনুষ্য ধর্মের অভাব ঘটে নাই। পৃথিবীর মানুষের মতই তাহারা প্রাণবান, নড় ও গতিশীল, শুধু থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের অঙ্গ হইতে এমন একটী শান্ত, মধুর, অনৈসর্গিক জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়ে যাহা দেখিয়া সন্দেহ হয়, ইহারা হয়তো বা এ মরলোকের জীব নয়, ইহারা নামিয়া আসিয়াছে কোনও উচ্চতর উর্দ্ধতর ভাবলোক হইতে।

প্রহসনের জগতে রবীন্দ্রনাথের দান একটু খানি নয়। বঙ্গদেশে প্রহসনীয় প্রতিভার কোন দিনই অভাব ঘটে নাই, এ কথা সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানের চোখে প্রাচীন প্রহসনগুলি কেমন যেন নোংরা, কাদামাখা বলিয়া ঠেকে। দীনবন্ধুর হোঁদল কুৎকুত রসিকতাই ছিল তৎকালীন প্রহসনের বৈশিষ্ট। কোনও বিদ্‌ঘুটে ঘটনা অথবা বিটকেল চারিত্রিক দোষ অবলম্বন না করিয়া প্রাচীন হাস্যরসিকেরা হাস্যরস জমাইতে পারিতেন না। বঙ্গীয় প্রহসনকে রবীন্দ্রনাথ এই নোংরামি, এই রুচিহীনতার হাত হইতে উদ্ধার করেন। তিনিই প্রথম দেখান যে, একজনকে হাসাইবার জন্য আর একজনকে চাঁটি মারিবার প্রয়োজন নাই। 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শেষরক্ষা' বা 'চির-কুমার সভা' ও প্রাত্যহিক মানুষের দোষ-ক্রুটী লইয়া গ্রথিত। কিন্তু স্কুল মাস্টারের ন্যায় এই সকল দোষ-ক্রুটীর মালিককে চাবুক মারিবার লোভ তাঁহার কখনও হয় নাই। এই সব মানুষের পক্ষে এই সব নিতান্ত স্বাভাবিক বিচ্যুতি তিনি দূর হইতে দেখিয়াছেন, দেখিয়া হাসিয়াছেন, এবং পরে সেই হাসির অংশ লইতে লোক সমাজকে আহ্বান করিয়াছেন।

এদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের বেশী নাটক অভিনীত হয় নাই। সে আমাদের ভাগ্যের কথা! কারণ সাধারণ রঙ্গালয়ে সাধারণ অভিনয় দ্বারা সাধারণকে তৃপ্তি দিবার জন্য রবীন্দ্র নাথ নাটক লিখেন নাই। যাঁহাদের মগজে ভাবলোকের বীজোপম অস্তিত্ব নাই। তাঁহাদের পক্ষে কবির ভাবগর্ভ নাটকগুলি অভিনয় করিবার চেষ্টা মাত্র লোক হাসাইবে। রবীন্দ্র নাটকের অন্তঃস্থিত সত্যগুলিকে লোকের হৃদয়ে গাঁথিয়া দিতে হইলে ভিন্ন বিধির প্রযোজনা, ভিন্ন বিধির পরিচালনা, ভিন্ন বিধির অভিনয়ের প্রয়োজন। কোন সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। ইংলণ্ডে যেমন সেক্সপীয়র অভিনয়ের জন্য স্বতন্ত্র অভিনেতৃ সঙ্ঘ আছে, এদেশেও সেইরূপ রবীন্দ্র নাটকাভিনয়ের জন্য স্বতন্ত্র অভিনেতৃ সঙ্ঘ স্থাপন করার প্রয়োজন। তবে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ শুধু শান্তিনিকেতনেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, দেশের সাধারণের কাছেও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। তবেই দেশ রবীন্দ্রবাদকে মর্ম্মে গ্রহণ করিতে শিখিবে।

> "যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানব-লীলা আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়দের জন্যে অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

আমার জীবন

(শেষখণ্ড)

গোপাল ভৌমিক

৭

বৃষ্টি-বহুল, পঙ্কিল অন্ধকার হেমন্তকাল এল ; আমাদের কাজেরও চাহিদা ক'মে গেল। আমি সপ্তাহে তিন দিন কর্মহীন অবস্থায় বাড়ীতে ব'সে থাক্‌তাম কিংবা অন্য কোন কাজ কর্‌তাম ; দৈনিক কুড়ি কোপেক বেতনে মাটি কাটতাম। ডাক্তার ব্লাগোভো পিটার্স-বার্গে চ'লে গেছিলেন—বোনও আর আমায় দেখ্‌তে আস্‌ত না। র‍্যাডিশ্‌ অসুস্থ হ'য়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাড়ীতে শু'য়েছিল !

আমার মনেও হেমন্তের প্রভাব ; হয়ত আমি যখন শ্রমিকের কাজ গ্রহণ ক'রেছিলাম তখন সহরের খারাপ দিকটাই শুধু দেখেছিলাম আর রোজই এই অন্ধকার দিকটার নতুন নতুন আবিষ্কার আমায় হতাশ ক'রে তুল্‌ত। আমার সহরের প্রতিবেশিদের মধ্যে যাদের সম্বন্ধে আগে আমার খারাপ ধারণা ছিল অথবা যাদের আমি ভাল মনে ক'রতাম সবাইকে আমি হীন, নিষ্ঠুর—সর্বপ্রকার হীন কাজ কর্‌তে সমর্থ ব'লে মনে কর্‌তে লাগলাম। গরীব আমরা—আমাদের প্রতি কত অত্যাচার হ'ত। হিসাবের সময় আমাদের ঠকানো হ'ত—ঠাণ্ডা পথে কিংবা রান্নাঘরে আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রাখা হ'ত—আমাদের সঙ্গে কেউ ভদ্র ব্যবহার করত না—সবাই কর্‌ত অপমান। হেমন্তকালে আমাকে ক্লাবের লাইব্রেরী এবং অন্য দুটি ঘ'রে কাগজ লাগাতে হ'য়েছিল। আমাকে প্রত্যেকটির জন্য সাত কোপেক্ ক'রে দেওয়া হ'ত কিন্তু আমাকে বারো কোপেকের রসিদ দিতে বলা হ'য়েছিল। আমি আপত্তি করায় লাইব্রেরীরই একজন কর্তা, সোণার চশমা পরিহিত একজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক বল্‌লেন : 'বদ্‌মায়েস, তুমি যদি আরেকটি কথা বলো, আমি তোমাকে মেরে শপাট কর্‌বো !"

এই সময় একটি চাকর তাঁকে চুপি চুপি জানিয়ে দিল যে আমি স্থপতি পলোজ্‌নিভের পুত্র তিনি প্রথমটা একটু বিব্রত এবং লজ্জিত হলেন কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন : "ও অভিশপ্ত হোক্ !"

দোকানে আমাদের শ্রমিকদের কাছে বিক্রী করা হ'ত পচা মাংস, খারাপ ময়দা আর মোটা চা। গির্জায় আমাদের পুলিশের ধাক্কা সহ্য করতে হ'ত—হাসপাতালে

সহকারী চিকিৎসক এবং নার্স্‌রা আমাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় কর্‌ত; দারিদ্র্যের জন্য আমরা যদি ঘুষ দিতে না পার্‌তাম, আমাদের খাবার দেওয়া হ'ত ময়লা ডিসে। ডাকঘরে সকলের ছোট কর্মচারীও আমাদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করাটা তার কর্তব্য বলে মনে কর্‌ত এবং কর্কশ উদ্ধত ভাষায় চীৎকার কর্‌ত "দাঁড়াও! ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ভিতরে এসে হাজির হ'য়ো না।" এমন কি কুকুরগুলোও ছিল আমাদের বিরুদ্ধে—সেগুলোও একটা বিশেষ ঘৃণার সঙ্গেই যেন আমাদের আক্রমণ কর্‌ত। কিন্তু এই নতুন জীবনে সব চেয়ে যে জিনিসটা আমার বেশী চোখে প'ড়েছিল সেটা হ'চ্ছে ন্যায়ের পরিপূর্ণ অভাব—লোকে যার নাম দিয়েছে 'ভগবানকে-ভুলে'-যাওয়া'। জুয়াচুরি ছাড়া একটা দিনও কাট্‌ত না। দোকানী, ঠিকাদার, শ্রমিকরা নিজেরা, খরিদ্দাররা, সবাই প্রতারণা কর্‌ত। একথা জানা ছিল যে আমাদের দাবীর কথা কেউ বিবেচনা কর্‌ত না—আমাদের অর্জিত অর্থের জন্য আমাদের টাকা দিতে হ'ত—টুপি নামিয়ে যেতে হ'ত পিছনের দরজার দিকে।

লাইব্রেরীর পাশের একটা ঘরে আমি কাগজ লাগাচ্ছিলাম—সেদিন সন্ধ্যার সময় কাজ শেষ ক'রে আমি চলে যাব এমন সময় এক বোঝা বই নিয়ে ডল্‌ঝিকোভের মেয়ে সেখানে এসে হাজির। আমি অবনত হ'য়ে তাকে নমস্কার জানাল্‌ম।

"ওঃ আপনি কেমন আছেন?" তৎক্ষণাৎ আমাকে চিনে সে হাত বাড়িয়ে দিল। "আপনাকে দেখে খুব সুখী হ'লাম।"

সে থাম্‌ল; অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার জামা, আঁঠার ভাণ্ড এবং কাগজের দিকে তাকাল। আমি বিব্রত বোধ কর্‌লাম—সেও অস্বস্তি অনুভব কর্‌ছিল।

"আমার বিস্ময়-দৃষ্টিকে ক্ষমা করুন" সে বল্‌ল। "আমি আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি বিশেষ ক'রে ডাক্তার ব্লাগোভোর কাছ থেকে। তিনি আপনার বিষয়ে বড় উৎসাহী। আপনার বোনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, বেশ চমৎকার সহানুভূতিময়ী মেয়ে; কিন্তু আমি তাকে বোঝাতে পার্‌লাম না যে আপনার সরল জীবন যাপনে ভীতিপ্রদ কিছু নেই। অপর পক্ষে আপনিই সহরের সব চেয়ে চমৎকার লোক!"

আরেকবার সে আঁঠার ভাণ্ড এবং কাগজের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল: "আমাদের দুজনকে দেখা করানোর জন্য আমি ডাক্তার ব্লাগোভোকে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু হয় তিনি ভুলে' গেছিলেন নয় তাঁর সময় ছিল না। যাক্‌, আমাদের দুজনের দেখা ত হ'ল। আপনি যদি আমার বাড়ীতে যান, আমি খুব সুখী হ'ব। আপনার সঙ্গে আলাপ করার আমার প্রবল ইচ্ছা। আমি সরল লোক" সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে,

"আমি আশা করি আপনি লৌকিকতার তোয়াক্কা না ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমার বাবা এখন পিটার্সবার্গে আছেন।"

সে পাঠগৃহে গেল—তার পোষাকে খস্ খস্ ধ্বনি; সেদিন বাসায় ফিরে' অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম হ'ল না।

সেইবার হেমন্তকালে কে একজন সহৃদয় ব্যক্তি আমার জীবন যাত্রা সহজ ভাবে নির্বাহের জন্য মাঝে মাঝে উপহার পাঠাত—চা, কেমন্ বিস্কুট কিম্বা রোষ্ট মাংস। কার্-লোভ্না বল্‌ত যে একজন সৈন্য এসে উপহার গুলো দিয়ে যেত তবে কার কাছ থেকে সেই সৈন্যটি আস্‌ত তা' সে জান্‌ত না; সেই সৈন্যটি জিজ্ঞাসা কর্‌ত আমি ভাল আছি কি না এবং আমার গরম পোষাক আছে কি না। যখন তুষার পাত সুরু হ'ল, তখন এক-দিন সৈন্যটি আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি সুন্দর নরম স্কার্ফ্ দিয়ে গেছিল; স্কার্ফ্‌টার মধ্যথেকে একটা মৃদু নরম গন্ধ বেরুচ্ছিল আমি অনুমান কর্‌তে পার্‌লাম এই দয়াবতী পরীটি কে! কারণ স্কার্ফ্‌টায় অ্যানিউটা ব্লাগোভোর প্রিয় গন্ধ "লিলি অফ্ দি ভ্যালি"র গন্ধ।

শীতের সময়টায় বেশী কাজ পাওয়া গেল—আবার প্রফুল্লতা ফিরে' এল। র‍্যাডিশ বেঁচে উঠ্‌ল এবং আমরা সমাধিস্থলের গির্জায় কাজ কর্‌তে লাগ্‌লাম: আমাদের কাজ ছিল পবিত্র গির্জাটাকে গিল্টি করা। আমাদের সহকর্মিরা বল্‌ত যে বেশ পার-ষ্কার শান্ত এবং বিশেষ ভাল কাজ। আমরা একদিনে অনেকটা কাজ কর্‌তে পার্‌তাম, কাজেই তাড়াতাড়ি অজ্ঞাতসারে সময় কাট্‌তে লাগ্‌ল। কোন রকম শপথ করা, হাসি ঠাট্টা কিংবা জোর গলায় তর্ক হ'ত না। জায়গাটা এমন যে সবাইকে শান্ত এবং ভদ্র থাক্‌তে বাধ্য কর্‌ত আর সকলের মনে জাগাত শান্ত গম্ভীর ভাব। কাজে নিমগ্ন হ'য়ে আমরা মূর্তির মত অচল ভাবে দাঁড়িয়ে কিংবা ব'সে থাক্‌তাম। সমাধিস্থানের উপযুক্ত একটা গভীর নিস্তব্ধতা চারদিকে বিরাজ কর্‌ত কাজেই কোন যন্ত্র প'ড়ে গেলে কিংবা প্রদীপে তেলের শব্দ হ'লে, শব্দটা বড় হ'ত—ফলে ব্যাপার কি জান্‌বার জন্য আমরা চমকে ফিরে' দাঁড়াতাম। অনেকক্ষণ নীরবতার পর মৌমাছির দলের গুঞ্জনের মত একটা শব্দ শোনা যেত: কাছেই পাদ্রী একটি মৃতদেহের সৎকার করছেন নীচু গলায়; একজন গৃহচিত্রকর তারায় ঘেরা চাঁদের ছবি আঁক্‌তে আঁক্‌তে শান্তভাবে শীষ দিতে সুরু কর্‌ত—তারপর আমরা গির্জায় কাজ কর্‌ছি মনে প'ড়ে যাওয়াতে হঠাৎ থেমে যেত; অথবা র‍্যাডিশ্ নিজের মনে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ত: "যে কোন কিছু ঘট্‌তে পারে! যে কোন কিছু ঘটতে পারে!" অথবা আমাদের মাথার উপরে একটা মৃদু করুণ ঘণ্টাধ্বনি শোনা যেত—গৃহচিত্রকররা বল্‌ত যে নিশ্চয়ই

কোন ধনী লোককে গির্জায় আনা হ'চ্ছে……

ছোট গির্জাটির শান্ত আবহাওয়ায় আমার দিনগুলো কেটে যেত আর সন্ধ্যা বেলা আমি বিলিয়ার্ড্ খেল্‌তাম অথবা নিজের কষ্টার্জিত অর্থে কেনা সার্জের পোষাকটা প'রে থিয়েটারের গ্যালারীতে যেতাম। অ্যাঝোগুইনদের বাড়ীতে ইতিপূর্বেই নাটক সুরু হ'য়ে গেছিল এবং র‍্যাডিশ্ নিজে দৃশ্য সজ্জা করছিল। সে আমাকে অ্যাঝোগুইনদের বাড়ীতে নাটক এবং ট্যাব্‌লো'র কথা বল্‌ল। আমি ঈর্ষার সঙ্গে তার কথা শুনলাম। আমার মহড়ায় অংশ গ্রহণ কর্‌বার প্রবল ইচ্ছা ছিল কিন্তু অ্যাঝোগুইনদের বাড়ীতে যাবার সাহস ছিল না।

ক্রিস্ট্‌মাসের এক সপ্তাহ পূর্বে ডাক্তার ব্লাগোভো এলেন আমরা পুরণো তর্ক সুরু কর্‌লাম এবং সন্ধ্যায় বিলিয়ার্ড্ খেল্‌তাম। তিনি যখন বিলিয়ার্ড খেল্‌তেন তখন কোট খুলে' ফেল্‌তেন—ঘাড়ের কাছে শার্ট্‌টাও ঢিলে ক'রে দিতেন এবং সাধারণত নিজেকে একজন লম্পটের মত দেখাতে প্রয়াস পেতেন। তিনি সামান্য মদ খেতেন কিন্তু হল্লা করতেন প্রচুর এবং ভল্‌গার মত সস্তা মদের দোকানে এক একদিন সন্ধ্যাবেলা বিশ রুব্‌ল্ পর্যন্ত খরচ কর্‌তেন। আবার আমার বোন আমাকে দেখ্‌তে আসা সুরু কর্‌ল—তাদের দুজনের দেখা হ'লে তারা বিস্ময় প্রকাশ কর্‌ত কিন্তু আমি তার সুখী এবং দোষী মুখভাব দেখে বুঝতে পার্‌তাম যে এ সাক্ষাৎ হঠাৎ সাক্ষাৎ নয়। একদিন সন্ধ্যাবেলা বিলিয়ার্ড খেলার সময় ডাক্তার আমাকে বল্‌লেন: "আচ্ছা, আপনি কুমারী ডল্‌ঝিকভের সঙ্গে দেখা করেন না কেন? আপনি ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌নাকে জানেন না। সে বেশ চমৎকার বুদ্ধিমতী মেয়ে!"

তার বাবা বসন্তকালে আমায় কিরূপ অভ্যর্থনা ক'রেছিলেন আমি সে-কথা ডাক্তারকে বল্‌লাম।

"কি বুদ্ধি আপনার!" ডাক্তার হাস্‌লেন। "এঞ্জিনিয়ার, এক জিনিস আর তার মেয়ে আরেক জিনিস। সত্যি বন্ধু তাকে আপনার দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। মাঝে মাঝে যেয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন। চলুন কাল সন্ধ্যায় যাওয়া যাক্। যাবেন?"

তিনি আমাকে রাজী করলেন। পরদিন সন্ধ্যায় সার্জের পোষাক প'রে মনে কিছুটা অস্বস্তি নিয়েই কুমারী ডল্‌ঝিকভের সঙ্গে দেখা করতে চল্‌লাম। যেদিন সকাল বেলা কাজ চাইতে এসেছিলাম সেদিনের মত আজ আর দারোয়ানটাকে ততবেশী উদ্ধত এবং ভয়ংকর ব'লে মনে হ'ল না অথবা ঘরের আসবাব পত্রও তত পীড়াদায়ক মনে হ'ল না। ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌না আমার প্রত্যাশায় ছিল—আমাকে পুরানো বন্ধুর মত সাদর অভ্যর্থনা জানালো এবং আমার হাতে মৃদু উষ্ণ চাপ দিল। তার পরিধানে প্রশস্ত হাতাওয়ালা ধূসর

পোষাক—তার চুলগুলি একটু নতুন ধরণে রচিত—এক বছর পরে কেশ প্রসাধনের এই ধরণটি যখন আমাদের সহরের ফ্যাশান্ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তার নাম করণ হ'য়েছিল "কুকুরের কাণ"। কাণের উপর দিয়ে চুলগুলি আঁচ্ড়িয়ে পিছন দিকে রাখা হ'য়েছিল—ফলে ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্না'র মুখটা আরো প্রশস্ত দেখাচ্ছিল —অনেকটা তার বাবার মুখের মত—লাল, প্রশস্ত, অনেকটা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের মত। সুন্দরী এবং আভিজাত্য-সূচক চেহারা হ'লেও সে যুবতী নয়; চেহারা দেখে ত্রিশ বৎসর মনে হ'লেও তার প্রকৃত বয়েস বোধ হয় পঁচিশের বেশী নয়।

"প্রিয় ডাক্তার!" সে আমাকে বল্ল। "আমি তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞ! তিনি না চেষ্টা কর্‌লে আপনি নিশ্চয়ই আস্তেন না। আমি বিরক্তিতে প্রায় মৃতপ্রায় হ'য়ে আছি! বাবা আমাকে একা ফেলে চ'লে গেছেন—আমি যে নিজেকে নিয়ে কি করি ভেবে পাই না!" আমি কোথায় কাজ করি, কত বেতন পাই এবং কোথায় থাকি—সবই সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

"আপনি নিজে যা' রোজগার করেন তাকি শুধু নিজের জন্যই ব্যায় করেন?" সে প্রশ্ন কর্‌ল। "হ্যাঁ।"

"আপনি সুখী লোক" সে জবাব দিল। আমার মনে হয় যে জীবনের সব কিছু অনিষ্ট বিরক্তি, আলস্য এবং আধ্যাত্মিক শূন্যতার থেকে আসে—আর পরের উপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাক্‌লে এ সব আসা খুবই স্বাভাবিক। মনে কর্‌বেন না যে আমি আমি নিজের বুদ্ধি দেখাচ্ছি। আমি সত্যই এরকম মনে করি। ধনী হওয়া নীরস এবং অপ্রীতিকর! লোকে বলে ন্যায় ধন দ্বারা বন্ধু লাভ কর কারণ প্রকৃত পক্ষে ন্যায় ধন ব'লে কিছু নেই কিংবা থাক্‌তে পারে না।" সে গম্ভীর স্থিরদৃষ্টিতে আসবাবপত্রের দিকে তাকাল যেন সে কোন তালিকা পাঠ কর্‌ছে—তারপর ব'লে চল্‌ল: "আরাম এবং সুখের একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। ধীরে ধীরে প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন লোককেও তারা করতল গত করে। বাবা এবং আমি আগে সরল ভাবে দারিদ্রের মধ্যে বাস করতাম—আর এখন আপনিই দেখ্‌ছেন আমরা কেমন ভাবে বাস করি। অদ্ভুত নয় কি?" সে ঘাড় নাড়া দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল। "আমরা বছরে বিশ হাজার রুব্‌ল্ খরচ করি! তাও আবার এই পল্লীর সহরে!"

"মূলধন এবং শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী সুবিধা হিসাবে আরাম এবং সুখকে বিবেচনা কর্‌লে চল্‌বে না" আমি বল্‌লাম। "যত কঠিন এবং নোংরা কাজই হোক্, তার সাথে সুখের সহযোগিতা আমার কাছে সম্ভব ব'লে মনে হয়। আপনার পিতা ধনী কিন্তু তিনি নিজেই বলেন যে তিনি সাধারণ শ্রমিক এবং লুব্রিকেটরের কাজও ক'রেছিলেন।"

সে হেসে সস্নিগ্ধভাবে মাথা নাড়্ল।

"বাবা সময় সময় টাইউরিয়া (Tiuria) খান" সে বল্ল, "কিন্তু সেটা শুধু খেয়ালের বশে!"

একটি ঘণ্টা বেজে উঠ্ল—সেও উঠে দাঁড়াল।

"ধনী এবং শিক্ষিতদের বাকী সকলের মত কাজ করা উচিত", "সে বল্ল. "এবং যদি কোন সুখ থাকে তবে সেটা সবারই অধিগম্য হওয়া উচিত। বিশেষ সুবিধা ব'লে কিছু থাকা উচিত নয়। যাক্, যথেস্ট দর্শন-চর্চা করা গেছে। আমাকে আনন্দদায়ক কিছু বলুন। গৃহচিত্রকরদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু শুনান। তারা কি রকম? অদ্ভুত?"

ডাক্তার এলেন। আমি গৃহচিত্রকরদের সম্বন্ধে বল্‌তে সুরু করলাম কিন্তু অভ্যাস না থাকায় আমার যেন কেমন অদ্ভুত ঠেক্‌ল এবং মানবজাতি-তত্ত্ব-বৈজ্ঞানিকের মত গম্ভীর চি.।শীলতার সঙ্গে কথা বল্‌তে লাগ্‌লাম। ডাক্তারও শ্রমিকদের সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প বল্‌লেন। তিনি এদিকে ওদিকে দুল্‌তে লাগলেন—কাঁদ্‌লেন এবং হাঁটুর উপরে বস্‌লেন—আর যখন তিনি একজন মাতালের বর্ণনা দিলেন তখন মেঝেতে চিৎ হ'য়ে শু'য়ে পড়লেন। ঠিক অভিনয়ের মত তাঁর বর্ণনা এবং ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌না হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদে ফেল্‌লে। তারপর তিনি পিয়ানো বাজিয়ে জোর গলায় একটী গান গাইলেন; ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌না পাশে দাঁড়িয়ে কি গাইতে হ'বে ব'লে দিল এবং তিনি যখন ভুল করলেন তখন শুধরে দিল।

"আমি শুনেছি যে আপনিও গান করেন" আমি বল্‌লাল।

"আপনিও কি?" ডাক্তার চীৎকার ক'রে উঠলেন। "ইনি প্রসিদ্ধ সুগায়িকা—ইনি শিল্পী, আর বল্‌ছেন কি না 'আপনিও'? সাবধান, সাবধান!"

"আমি মনোযোগ দিয়ে সঙ্গীত চর্চা সুরু ক'রেছিলাম" সে জবাব দিল, "কিন্তু বর্তমানে ছেড়ে দিয়েছি!"

সে একটা নীচু টুলে ব'সে তার পিটার্স্‌বার্গের জীবন বর্ণনা করল—প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকাদের অনুকরণ করল—তাঁদের গলার দোষ এবং মুদ্রাদোষ পর্যন্ত। তারপরে সে আমার এবং ডাক্তারের ছবি আঁক্‌ল তার অ্যালবামে—খুব ভাল ছবি হয়নি অবশ্য তবে আমাদের সাদৃশ্য বেশ ভালই ফুটে ছিল। সে হাসি ঠাট্টা এবং মুখভঙ্গী করতে লাগল—অন্যায় ধনের সম্বন্ধে কথা বলার চেয়ে এইটাই তাকে বেশী মানায় ব'লে আমার মনে হ'ল। আমার আরও মনে হ'ল যে সে ধন এবং সুখের সম্বন্ধে যা-কিছু ব'লেছিল তা' তার নিজের মত নয়—অনুকরণ মাত্র। সে চমৎকার হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারে। আমি মনে মনে তাকে সহরের অন্যান্য মেয়ের সঙ্গে তুলনা করলাম—এমন কি সুন্দরী স্থির বুদ্ধি অ্যানিউটা ব্লাগোভোও

তার কাছে দাঁড়াতে পারে না ; একটি বন্য গোলাপ এবং একটি উদ্যানের গোলাপের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য, এদের বৈসাদৃশ্যও ততটা গভীর।

আমরা নৈশ ভোজের জন্য থেকে গেলাম। ডাক্তার এবং ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্না লাল মদ, শ্যাম্পেন এবং কগন্যাক্ দিয়ে কফি খেল, তারা গ্লাস্ স্পর্শ ক'রে বন্ধুত্ব, প্রগতি এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে মদ্যপান করল তারা মাতাল হ'ল না কিন্তু লাল হ'য়ে গেল এবং বিনা কারণে হাস্‌তে হাস্‌তে তাদের প্রায় কান্না পেয়ে গেল। দলছাড়া যাতে না হই, সেই উদ্দেশ্যে আমিও লাল মদ পান কর্‌লাম।

'প্রতিভাবান্ এবং ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাশালী লোকেরা' কুমারী ডলঝিকভ্ বলল, 'জানে কিরূপভাবে বেঁচে থাক্‌তে হয় এবং তারা তাদের নিজের পথ অনুসরণ করে ; কিন্তু আমার মত সাধারণ মানুষ কিছু জানে না এবং নিজের চেষ্টায় কিছু করতেও পাবে না ; তাদের পক্ষে একটা গভীর সামাজিক স্রোত আবিষ্কার ক'রে তাতে গা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই!"

"যেটার অস্তিত্বই নেই সেটা আবিষ্কার করা কি সম্ভব?" ডাক্তার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

"আমরা দেখি না ব'লেই মনে করি এর অস্তিত্ব নেই!"

"তাই নাকি? সামাজিক স্রোতটা হ'চ্ছে আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি। এখানে তার কোন অস্তিত্ব নেই!" আলোচনা সুরু হ'ল।

"কোন গভীর সামাজিক আন্দোলন আমাদের মধ্যে নেই এবং কখনও হয়ও নি" ডাক্তার বল্‌লেন।

আধুনিক সাহিত্য অনেক জিনিস আবিষ্কার ক'রেছে যেমন পল্লী জীবনে বুদ্ধিজীবী শ্রমিকের সৃষ্টি ক'রেছে কিন্তু সমস্ত গ্রামে ঘুরে বেড়ান—কি দেখ্‌তে পাবেন? দেখ্‌তে পাবেন জ্যাকেট কিংবা কালো ফ্রক্‌কোট পরা অতি সাধারণ লোক যে 'এক' কথাটার মধ্যে চারটে ভুল করে। আমাদের এখনও সভ্যজীবনই সুরু হয়নি'। পাঁচশ বছর আগের মতই আমাদের বর্বরতা, আমাদের দাসত্ব এবং আমাদের জীবনের তুচ্ছতা সব ঠিকই আছে। আন্দোলন, স্রোত—দীন শিশুসুলভ এই সব বাঁধা বুলি—এর কোন মূল্য নেই। আপনি মনে করতে পারেন যে আপনি একটা বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন আবিষ্কার ক'রেছেন এবং সেইটার অনুসরণ ক'রে আধুনিক ধরণে আপনি ইঁদুরকে দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা কিংবা মাংসের কাট্‌লেট খাওয়া নিবারণ করার চেষ্টা করতে পারেন ; সেজন্য ম্যাদাম, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু আমাদের এখনও অনেক কিছু শিখতে হ'বে—আমি জোর দিয়ে বলছি শিখতে হ'বে, সামাজিক আন্দোলনের জন্য সময় পাওয়া যাবে যথেষ্ট।

এখনও আমরা তার উপযুক্ত হই নি' এবং আমি শপথ ক'রে বলতে পারি আমরা তার কিছু বুঝি না !"

"আপনি না বুঝতে পারেন কিন্তু আমি বুঝি" ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্না বল্ল। "হায় ভগবান্ ! আজ রাতে আপনি এত বিরক্তিকর হ'য়ে উঠেছেন !"

"আমাদের কাজ হ'চ্ছে শিক্ষা করা, চেষ্টা ক'রে যতটা সম্ভব জ্ঞান সঞ্চয় করা কারণ সত্যিকারের জ্ঞানের থেকেই সামাজিক আন্দোলনের জন্ম এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ সুখ বিজ্ঞানের মধ্যে নিহিত। জ্ঞানের থেকেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত !"

"একটা জিনিস সুস্পষ্ট। জীবনকে অন্যরকমে সাজান দরকার" কিছুক্ষণ নীরবে গভীর চিন্তা ক'রে ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্না বল্ল, "এ পর্যন্ত যে জীবন আমরা যাপন ক'রেছি তা' অর্থহীন ! যাক্, এ বিষয়ে আর কথা ব'লে প্রয়োজন নেই !"

যখন আমরা বিদায় নিলাম তখন গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজ্ল।

"আপনার ওকে পছন্দ হ'য়েছে ?" ডাক্তার প্রশ্ন করলেন। "বেশ চমৎকার মেয়ে, নয় ?" ক্রিস্ট্‌মাসের দিন আমরা ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্নার বাড়ীতে ভোজ খেলাম এবং তারপর ছুটির কয়দিন রোজই তার বাড়ীতে যেতাম। আমরা ছাড়া আর কেউ থাকত না—ম্যারিয়া ঠিকই ব'লেছিল যে সহরে আমরা ছাড়া তার আর কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না। আমরা বেশীর ভাগ সময় গল্প ক'রে কাটাতাম—কখনও কখনও ডাক্তার কোন বই বা পত্রিকা এনে জোরে পড়্‌তেন। প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনে ডাক্তারকেই আমি দেখলাম প্রথম সংস্কৃতিশীল মানুষ। বলতে পারি না তিনি বেশী কিছু জান্‌তেন কি না তবে জ্ঞানের বিষয়ে তিনি ছিলেন উদার কারণ তিনি চাইতেন যে অন্যেও জানুক। তিনি যখন চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে কথা বল্‌তেন তখন আমাদের স্থানীয় ডাক্তারদের মত কথা তিনি বল্‌তেন না ; মনে একটা নতুন ধরণের বিচিত্র ছাপ তিনি রাখ্‌তেন—আমার মনে হ'ত যে তিনি ইচ্ছা করলে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হ'তে পার্‌তেন। বোধ হয় সে সময় একমাত্র তাঁরই কিছু প্রভাব ছিল আমার উপরে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে এবং তাঁর দেওয়া বই পড়ার ফলে আমি ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগ্‌লাম যে আমার কাজের একঘেয়েমি দূর করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। আমি এর আগে জান্‌তাম না যে সমস্ত পৃথিবী ষাটটি উপাদানের সমষ্টি—এই অজ্ঞতা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেক্‌তে লাগল। আমি জান্‌তাম্ না চিত্র কার্যের তেলটা কি জিনিস—এসব না জেনেই আমার কি ক'রে চ'লে যাচ্ছিল ! ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমার নৈতিক উন্নতিও হ'ল। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতাম এবং সাধারণত আমার নিজের মত আঁকড়ে ধ'রে থাক্‌লেও আমি ধীরে ধীরে তাঁর সাহায্যে বুঝতে পার্‌লাম যে

আমার কাছে সব কিছু সুস্পষ্ট নয়। আমি আমার ধারণাগুলোকে যতদূর সম্ভব নিশ্চিত করার চেষ্টা করলাম যাতে আমার বিবেকের বাণীগুলোতে কোন অস্পষ্টতা না থাকে এবং সেগুলো ঠিক হয়। শিক্ষিত এবং সদাচারী হ'লেও এবং সহরের সব চেয়ে ভাল লোক হ'লেও, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণতা ছিল না। তাঁর ব্যবহারের মধ্যে-উদ্ধত এবং গর্বিত ভাব ছিল—আলাপ আলোচনাকে তিনি তর্কের কোঠায় টেনে নামানোর চেষ্টা করতেন এবং যখন তিনি কোট খুলে' শার্ট গায়ে দিয়ে ব'সে চাকরটাকে ঘুষ দিতেন তখন আমার মনে হ'ত যে সংস্কৃতি তাঁর চরিত্রের একটা অংশ মাত্র—বাকীটা অসভ্য তাতার।

ছুটির পরে আবার তিনি পিটার্সবার্গে গেলেন। তিনি সকালে গেলেন এবং মধ্যাহ্নে ভোজের পর আমার বোন আমায় দেখতে এল। গায়ের পোষাকটা না খুলেই সে নীরবে ব'সে রইল—ভয়ানক বিবর্ণ তার চেহারা—চোখে স্থির দৃষ্টি! সে কাঁপতে সুরু করল—"তোমার নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগেছে" আমি বল্লাম।

তার চোখ জলে ভ'রে গেল। সে একটাও কথা না ব'লে উঠে' কারপোভনার কাছে গেল যেন আমি তাকে আঘাত দিয়েছি। কিছুক্ষণ পরে আমি তাকে কঠিন তিরস্কারের সুরে কথা বলতে শুনলাম।

"আয়া, আমি এ পর্যন্ত কেন বেঁচে আছি? কেন? আমায় বল; আমি কি যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি নষ্ট করি নি'? জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলিতে আমি হিসাব রাখা, চা তৈরী করা, কোপেক গোণা, অতিথি সেবা করা ছাড়া আর কিছু করি নি'—পৃথিবীতে আরও যে ভাল কিছু আছে সে চিন্তাই আমার মনে উঠে নি। আয়া আমার কথা বুঝবার চেষ্টা করো, আমারও ত মানুষের মত কামনা আছে—আমি বাঁচতে চাই অথচ ওরা আমাকে গৃহরক্ষিকা বানিয়েছে। এটা ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর!"

সে দরজায় তার চাবির গোছা ফেলে দিল—ঝন ঝন্ ক'রে পড়ল এসে আমার ঘরে। চায়ের বাক্স, খাবারের বাক্স, সেলার প্রভৃতির জন্য সে চাবিগুলো ব্যবহৃত হ'ত—মা বেঁচে থাকতে তিনিই সেগুলো ব্যবহার করতেন।

"আঃ আঃ, স্বর্গের দেবদূতগণ!" ভয়ে বৃদ্ধা আয়া চীৎকার ক'রে উঠল। "সুখী মহাত্মারা!"

চ'লে যাবার আগে আমার বোন ঘরে এসে চাবিগুলো চাইল; বলল: "আমায় ক্ষমা করো। কিছুদিন ধ'রে আমার মধ্যে কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে!" (ক্রমশ)

পরিচয়

গ্রন্থ

সামরী—(অনুবাদ উপন্যাস)—তারাপদ রাহা। দি পাবলিশার্স, কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ। দাম একটাকা

জার্মান-সাহিত্যিক লিওনহার্ড ফ্রাঙ্ক-এর বিখ্যাত গ্রন্থ কার্ল অ্যাণ্ড অ্যানার অনুবাদ ক'রেছেন সুসাহিত্যিক তারাপদ রাহা। কার্ল অ্যাণ্ড অ্যানা বইখানি লিখে ফ্রাঙ্ক নাৎসী জার্মানী থেকে বিতাড়িত হ'য়েছিলেন। গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় কার্ল অ্যাণ্ড অ্যানা উপন্যাসখানির আখ্যান ভাগ গড়ে উঠেছে। যুদ্ধের কুফল প্রদর্শন করা গ্রন্থকারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, মনস্তত্ত্বমূলক প্রেমই মুখ্য গল্পাংশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মনস্তত্ত্বমূলক প্রেমের বিশ্লেষণে গ্রন্থকার অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছুটি পুরুষ ও একটি নারীকে কেন্দ্র ক'রেই এই উপন্যাসখানি রচিত হ'য়েছে। রিচার্ড ও তার স্ত্রী অ্যানা এবং রিচার্ডের বন্ধু কার্ল—এরাই গল্পের প্রধান নায়কনায়িকা। রিচার্ড অ্যানাকে বিয়ে করার কয়েকদিন পরেই যুদ্ধক্ষেত্রে চ'লে যেতে বাধ্য হয়। বহুদিন তাকে যুদ্ধের বন্দী হিসাবে থাকতে হয়—সেখানে কার্লের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। কার্লকে রিচার্ড দিনরাত অ্যানার কথা বল্‌ত—অ্যানা তাকে কত ভালবাসে, সে নিজে অ্যানাকে কত ভালবাসে—এমনই তাদের বিবাহিত জীবনের কত কি কথা! ধীরে ধীরে কার্লের বুভুক্ষু হৃদয় অ্যানার প্রতি আকৃষ্ট হয়—না দেখেই সে অ্যানাকে ভালবেসে ফেলে। অবশেষে একদিন পালিয়ে সে অ্যানার কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং নিজেকে রিচার্ড ব'লে পরিচয় দেয়। রিচার্ডের কথা অ্যানার ভাল ক'রে মনে পড়ে না—তবু সে প্রথমটা কার্লকে অবিশ্বাস করে! কিন্তু কার্ল তাদের বিবাহিত জীবনের এত খুঁটিনাটি জানে যে সে অ্যানাকে অভিভূত ক'রে দেয়। অ্যানা কার্লের অপরিসীম ভালবাসার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। ধীরে ধীরে সে রিচার্ডের কাছে আত্মদান ক'রে বসে। অ্যানার মনের দ্বন্দ্বের এমন চমৎকার বিশ্লেষণ লেখক করেছেন যে তার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। বইয়ের সমাপ্তিটি হ'য়েছে বড় করুণ। হতভাগ্য রিচার্ড ফিরে এসে দেখ্‌ল যে তার এতদিনের স্বপ্ন, তার এত আশা আকাংখা সব ধুলিসাৎ হ'য়েছে। তার প্রিয়তমা পত্নী কার্লের অধিকারে চ'লে গেছে। রিচার্ডের ট্রাজেডি আমাদের হৃদয় স্পর্শ না ক'রে পারে না। কার্ল অ্যাণ্ড অ্যানার গল্পাংশ এত জমাট যে বইটি একেবারে শেষ না ক'রে ওঠা যায় না।

আনুবাদিক হিসাবে সুসাহিত্যিক তারাপদ রাহার যথেষ্ট সুনাম আছে। এই বইটি অনুবাদ করতে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনাড়ষ্ট স্বচ্ছ ভাষায় অনূদিত 'সামরী' বইখানি সুখপাঠ্য হ'য়েছে। কাল অ্যাণ্ড অ্যানার মত প্রসিদ্ধ একখানি উপন্যাসকে বাঙ্গালায় অনূদিত ক'রে তারাপদবাবু বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক'রেছেন এবং পাঠক সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হ'য়েছেন।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। পাঠক সমাজে 'সামরীর' সমাদর হ'বে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে

কল্পনা—কালীশ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক সংস্কৃতি পরিষদ্, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। দাম সাত আনা।

'কল্পনা' শিশুদের জন্য রচিত বই। গ্রন্থকার কালীশ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত। 'কল্পনা'য় তিনি রূপকের সাহায্যে শিশুদের জন্য একটি কাহিনী রচনা ক'রেছেন—প্রকৃতপক্ষে কাহিনীটি স্বদেশ-প্রেমের কাহিনী—বাংলা দেশের অনেক গুণ গান এতে আছে। মোটকথা শিশুদের শিক্ষাপ্রদ অনেক কিছু এতে আছে। গ্রন্থকারের গল্প বলার ভঙ্গীটি কিন্তু এখনও কাঁচা, তাঁর আড়ষ্টতা এখনও কাটে নি'। এই আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লে তিনি কালে ভাল লেখক হ'তে পারেন। বইটির ছাপা, ছবি এবং বাঁধাই ভাল। প্রচ্ছদপটের রূপ-সজ্জাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাদের জন্য বইটি লেখা হ'য়েছে তারা বইখানি প'ড়ে খুসী হ'বে ব'লেই মনে হয়।

গোপাল ভৌমিক

চিত্র

প্রতিশ্রুতি

অরুণ আর শান্তি একই গ্রামে পাশাপাশি ঘরেই বাস তা'দের। অরুণের বাবা তাঁর একটি বেশ বড় রকমের মুদিখানা; শান্তির বাবা সম্পর্কে তাঁ'রই ভাই, তবে সদ্ভাব নেই। কিন্তু অরুণ ও শান্তির খু-ব ভাব। অরুণের দাদা কুমার কলকাতায় কলেজে পড়েন। হোষ্টেলে থাকেন—ভালবাসেন অনুভা—কিন্তু যেহেতু তাঁ'র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে 'জমীর' উপর সেই হেতু তাঁ'র হ'লনা বিয়ে তা'র সঙ্গে। যদিও অনুভা তা'কে খু-ব ভালবাসে। ব্যর্থ প্রেমের বেদনাকে ভোলার জন্তেই কুমার ফিরে এল দেশে—কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তা'কে হারাতে হোলো. তা'র বাবাকে—সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য এসে পড়ল তারই স্কন্ধে—কুমারের ব্রত হ'ল অরুণকে মানুষ করা—ও পিতৃসত্য পালন করা।

অরুণ সুখে দুঃখে মানুষ হ'তে লাগ্‌ল—ম্যাট্রিকে জলপানি পেয়ে পাশ করল—ও যথা সময়ে কলকাতায় কলেজেও তা'কে আসতে হ'ল।

কলকাতায় এসে অরুণ বন্ধুর পাল্লায় প'ড়ে উচ্ছন্নে গেল—নর্দান এভিনিউ নিবাসী শ্রীমতী সুমিত্রা দেবীর প্রেমে সে হাবুডুবু খেতে লাগ্‌ল। সুমিত্রা একজন বারবণিতা। কুমারের কানে একথা পৌঁছাল—অরুণের মা সে কথা শুনে একেবারে মৃত্যু শয্যা লাভ করলেন। অরুণ খবর পেলনা। যেহেতু হোষ্টেলে সে থাক্‌তোনা—মা মারা গেলেন।

অরুণ দেশে এলো, কিন্তু থাকতে না পেরে কলকাতা পালিয়ে গেল।

কুমার প্রথমে অবশ্য অরুণের সম্বন্ধে এ কথা বিশ্বাস করেনি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা'কে বিশ্বাস করতে হ'ল।

অরুণের টাকা বন্ধ হলো। সে হ'ল সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত। সুমিত্রা তা'কে ভালবাসে।

এদিকে শান্তি গ্রামে ঠাকুরকে ডাকে আর বলে, সেকি ফিরে আসবে?—শান্তি তা'কে ৭৫০ পাঠালো তা'র নিজের পূঁজি থেকে—কিন্তু লিখ্‌লো "তোমার মায়ের গচ্ছিত টাকা থেকে পাঠালাম।"

অরুণের টাকা চাই—সে ফিরে এলো দেশে—তা'র ধারণা তা'র মা হয়তো আরো টাকা রেখে গেছেন শান্তির কাছে।

কিন্তু—টাকা পাওয়া দূরের কথা—তা'কে কুমার অর্ধচন্দ্র দিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিল।

সুমিত্রা অরুণকে বাঁচাতে চায়, তাই সে তাকে বল্ল ফিরে যেতে। অরুণ ফিরতে চায়না—সে সুমিত্রাকে খু-ব ভালবাসে।

সুপারিনটেনডেন্টের চিঠি পেয়ে কুমার আসে ক'লকাতায়—সুমিত্রার বাড়ীতে তা'র সঙ্গে দেখা হয় অরুণের। অরুণকে যথেষ্ট তিরস্কার করে কুমার যখন নেমে যাচ্ছিল তা'র বাড়ী থেকে, ঠিক তখনই রিভলবারের আওয়াজে সে উপরে এসে দেখ্‌লো সুমিত্রাকে খুন ক'রেছে অরুণ।

অরুণকে বাঁচাতে হবে—কুমার তা'কে কোন রকমে বাড়ী থেকে বার করে' গ্রামে ফিরে এল। পুলিসে তদন্ত চলতে লাগ্‌লো।

অরুণ আর শান্তির যে রাতে বিয়ে সেই রাতে খিড়কীর দরজায় অপেক্ষা করছিল পুলিশ ও ইনেসপেকটর—কুমার তাদের চিঠি লিখেছিল নিজেকেই দোষী বলে।

কুমারকে বন্দীকরে নিয়ে গেল তারা। অরুণ খবর পেয়ে থানায় গেল। কিন্তু কিছুই হলনা।

কুমারের চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড হ'ল। কুমার অরুণকে বলে' গেল "ফিরে এসে যেন তো'কে দেখি তুই মানুষ হয়েছিস।"

*　　*　　*　　*　　*

নায়ক অরুণের ভূমিকায় অসিতবরণ চলনসই। প্রথমদিকে তা'র অভিনয় সুন্দর—কিন্তু সেই তুলনায় শেষের দিকে—বিশেষতঃ সুমিত্রারূপে চন্দ্রাবতীর সাথে তা'র অভিনয় একেবারে অচল ও ব্যর্থ। এজন্যে দোষ অবশ্য পরিচালক হেমচন্দ্রের। গানের আসরে অসিতবরণ পরিচিত কিন্তু সুরশিল্পী রাইচাঁদ বড়াল কি ধরণের গান যে তা'র কণ্ঠে ভাল ও সরল হয় সে বিবেচনা আদৌ করেননি। সুমিত্রার ঘরে অরুণকে যাত্রাদলের রাজপুত্রের মত একটি জাপানী-স্যাটীন-সিল্কের আলখাল্লা পরিয়ে পিয়ানোর সামনে বসিয়ে গান করানোর কোনই অর্থ হয় না। মোটের উপর পরিচালক অসিতবরণকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা করেছেন।

কুমারের ভূমিকায় পাহাড়ী স্যান্যালের অভিনয় অপূর্ব্ব সুন্দর। তিনি যে এত ভাল অভিনয় করতে পারেন এ ধারণা কারো এতদিন ছিলনা। চন্দ্রাবতীর অভিনয় ও অনুরূপ।

ভারতী শান্তির চরিত্রকে চমৎকার ফুটিয়া তুলেছেন। ভারতীর হাঁটা-চলা, কথা-বলা সত্যই হৃদয়গ্রাহী—অরুণের সাথে তার দ্বৈত সঙ্গীতটিতে তা'কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি।

অনুভার ভূমিকায় প্রতিমা মুখার্জ্জীকে বেশ মানিয়েছে। সুপ্রভা মুখার্জ্জী অরুণের মায়ের ভূমিকায় মন্দ অভিনয় করেননি—তবে তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি তাঁর মার্জ্জিত উচ্চারণকে সংযত করার চেষ্টা করেছেন।

অন্যান্য ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী ও বিনয় গোস্বামী মন্দ অভিনয় করে নি। আবহ সঙ্গীত এক ঘেঁয়ে—গানের সুরগুলি একেবারে বৈশিষ্টহীন। কাহিনী ও সংলাপ খুবই উচ্চস্তরের। রেকর্ডিংএর দোষে দু'এক জায়গায় গান ও কয়েকটি কথা জড়িয়ে গিয়েছে। চিত্রগ্রহণ মন্দ নয়।

বিমল দত্ত

সম্পাদকীয়

২২এ শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল (ইং ৭ই আগস্ট, ১৯৪১) বৃহস্পতিবার,—এই দিনটি পঞ্জিকাভূত হবে আশা করি।

রবীন্দ্রনাথ নেই : কথাটি সহজেই উচ্চারণ করা যায় বটে, কিন্তু ভাবতে গেলে তেমন সহজে ভাবা যায়না যেন। যখন তিনি ছিলেন, তখন তাঁর না-থাকার দিনের কথা কল্পনা করতে যতটা আতঙ্ক বোধ হ'তো, আজ সত্যিকার না-থাকায় পূর্ব্বাহ্নের সে-আতঙ্ক কেটে গেছে। কিন্তু নতুনভাবে একটি অস্বাস্থ্যকর অবসাদ এসে আতঙ্কের স্থান পূরণ করে ব'সেছে।

●

একটা বিপর্যয় ঘ'টে গেলো বলা চলে। চারদিক থেকেই বিপর্যয়। তিনি চিরকাল আমাদের গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি হ'য়ে থাকবেন—এমন আশা করা অবশ্য অন্যায়। গান্ধীজি গত ১লা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথকে পাঁচকুড়ি পূর্ণ করার জন্যে অনুরোধ ক'রে তার পাঠিয়ে-ছিলেন—কারণ, চারকুড়ি যথেষ্ট ব'লে গান্ধীজির মনে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যদি গান্ধীজির অনুরোধ এ-ভাবে উপেক্ষা ক'রে চ'লে না যেতেন, তা'হলে হয়ত আমরা ছয়কুড়ির জন্যে আব্দার করতাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাউকে আস্কারা দিলেন না। যখন তিনি বুঝলেন, তাঁর সময় হ'য়েছে নিকট, তখনই তিনি বাঁধন ছিঁড়ে ফেললেন।

●

এ গেলো বাইরের বন্ধনটুকু। আমাদের মনে মনে যে অদৃশ্য সূতোর মজবুত গ্রন্থিটি তিনি অটুট রেখে গেলেন, ইতিমধ্যে সে-গ্রন্থি আরো দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে—ক্রমশ আরো দৃঢ় হ'য়ে উঠবে ব'লেই মনে হ'চ্ছে। অথচ বাইরের এই বিচ্ছেদটি আজ খুবই বড় ব'লে ঠেক্‌ছে। যতদিন-না এই ব্যবধান গা-সওয়া হ'য়ে ওঠে, ততদিন এটুকু কষ্ট ভোগ অবশ্য করতে হবে। চারদিকে নানাজনের নানা রকম কষ্ট বিভিন্ন প্রকারের উচ্ছ্বাসে সাবানের ফেনার মত ইতিমধ্যেই উড়তে আরম্ভ করেছে।—

●

সমগ্র ঘটনা প্রথম থেকে আমরা দেখতে আরম্ভ করি : তাঁর জোড়াসাঁকোর বাস-ভূমিতে কলধ্বনি। কবিকে অন্তিম নিশ্বাসটিও আরাম করে ফেলতে দেওয়া হয়নি ব'লেই ধরে নেওয়া চলে। যদি এটা ভালোবাসার অত্যাচার নামে কাটিয়ে দিতে চাই, তবুও অত্যাচারের চাপে ভালোবাসা-টি সাময়িক ভাবেও অন্তত জখম হ'য়েছিলো ব'লে স্বীকার করতে হবে। বাঙলার ছাত্রসমাজকে অনেকে এ জন্যে দায়ী করছেন—ছাত্রসমাজের নিন্দা শুনতে ভালো লাগেনা—অথচ প্রতিবাদ করার কোনো নজির পর্যন্ত নেই। দুঃখ যখন ঠিক ঋাতে গিয়ে লাগে, তখন মানুষ বোবা হ'য়ে যায়, তখন কারো রেলিঙ টপকাবার সাফল্যে মুখ দিয়ে হুইসল্ বা'র হয় না। জোড়াসাঁকোর বহুবিধ দৃশ্যের মধ্যে একটির উল্লেখ করলাম মাত্র। —তাই ভাবছি, অনুভূতি-টা এমন ভোঁতা হ'য়ে যাবার কারণ কি? কালচারের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি সজাগ হয় ব'লে শুনেছি। বাঙলার ছাত্রসমাজ কালচারহীন এ-কথা কি ক'রে বিশ্বাস করি? তারপর মিছিলের দৃশ্য : স্বয়ং মিছিলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে থাকায় দৃশ্যটি ঠিক চোখে পড়েনি, কিন্তু পরে দৃশ্যটি চলচ্চিত্রে দেখে লজ্জায় অধোমুখ হ'তে হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের শবযাত্রায় যোগ দিয়ে চ'লেছে ছাত্রশ্রেণী—ইতিমধ্যে ক্যামেরা দেখামাত্র রবীন্দ্রনাথের কথা ভুলে গিয়ে ক্যামেরার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী হাততালি দন্তবিকাশ বুকস্ফীত ক'রে দাঁড়ান ইত্যাদি নানাবিধ কৌশল দেখাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। নিজেরা না হয় কিল খেয়ে কিল চুরি করছি। কিন্তু এই ছবি যখন অ-বাঙালী ও অ-ভারতবাসীরা দেখবে, তখন তারা কি ভাববে—এই কথা ভেবে রীতিমত ভয় পাচ্ছি। এতবড় কেলেঙ্কারী আর হয়নি। চিত্তরঞ্জনের যতীনদাসের জে. এম্. সেনগুপ্তের সময় এতটা বিপর্যয় ঘটেনি। কবিদের ভাগ্যে এ-রকম বিপর্যয় ঘটাই স্বাভাবিক। চারদিক থেকেই বিপর্যয়—তাঁর মৃত্যুর পর এতটুকু দেরি না ক'রে দ্রুতবেগে শবযাত্রা আরম্ভ হ'য়ে গেলো : আমরা সৌভাগ্যবান, শেষ-দর্শন আমরা লাভ ক'রেছি,—কিন্তু দুর্ভাগাদের সংখ্যা কত তার হিসেব ক'রে লাভ নেই। এত তাড়াহুড়ো করার কৈফিয়ৎ অবশ্যই আছে : সে-জন্যেও দায়ী করা হ'চ্ছে ছাত্রসমাজকে।—তাদের অত্যাচারেই নাকি শেষ ক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিলো। এ-কৈফিয়ৎ মেনে নিতে ইচ্ছে হয়না। অনেকগুলি প্রধান না থেকে একজনকে প্রধান মেনে নিলে এ-বিপর্যয় হ'তো না ব'লে বিশ্বাস। ভিতরের সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জানা সম্ভব নয়, ওটা নেহাৎ সাংসারিক ব্যাপার—তবে, একটা কিছু সুব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলো। ঘোড়দৌড় ক'রে শবযাত্রাও এই প্রথম দেখলাম। মনে হ'লো, ঘটনাটিকে কেউ-যেন মর্মস্পর্শী ব'লে মনেই করলোনা। কবিদের ভাগ্যে একটু ছন্ন ছাড়া নিয়মই খাপ খায় অবশ্য। এ নিয়ে অনুযোগ করা মিথ্যে। এমন-কি শান্তিনিকেতন থেকেও সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখাটা শিষ্টাচার অনুমোদিত হয়নি ব'লেই বিশ্বাস। শান্তি-

নিকেতনের শান্তি বজায় রাখার জন্যেই এই পথ অবশ্য নিতে হয়েছে—কেননা কলকাতা ট্রাজেডির পর সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলো। এ-বিষয় বেশি কথা বললে কথাই কেবল বেড়ে যাবে, যা হবার তা হ'য়ে গেছে।

●

এখন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের পালা চলেছে। চারদিকে শোকসভা। একে সামাজিক শিষ্টাচার আখ্যা দেওয়া যায়—তার বেশি কিছু নয়। শোকসভা ক'রে রবীন্দ্রনাথের গুণাবলী ব্যাখ্যা না ক'রে অন্যভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের পথ আবিষ্কার করার চেষ্টা দরকার। পথ আছে বিস্তর। প্রয়োজন মনে করলে সময়ান্তরে সে-বিষয় আলোচনা করা যাবে— কিন্তু শুধু শোকসভা করার পক্ষপাতী আমরা নই। 'নানা ভাষায় আহা উহু ওহো' শোনার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন না। এই সংখ্যার প্রথমেই পনর বছর আগের জন্মদিনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি কবিতা পত্রস্থ ক'রেছি: সেখান থেকেই আপনারা তাঁর পুরো বক্তব্যটি শুনতে পাবেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁকে লক্ষ্য ক'রে এরি মধ্যে জনকয়েক কবি কবিতা লিখে প্রকাশ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছেন। কবির উদ্দেশে কবিতায় স্তুতি নিক্ষেপ—এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার আর কী হ'তে পারে? রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এই কবিযশপ্রার্থীদের করুণ কাৎরানী শুনে দুঃখের বদলে হাসি পায়: এও এক রকমের ক্যারিকেচার। দোষ দেওয়া চলেনা—পূর্বগামীরা পথ প্রদর্শন ক'রে গেছেন। মধুসূদনের মৃত্যুতে বৃত্র-সংহারের কবি হেমচন্দ্রের বিলাপ ও পলাশীর-যুদ্ধ প্রণেতা নবীনচন্দ্রের খেদ আমরা শুনেছি:

হায় হায় কবিবর এই কি তোমার
ছিল হে কপালে,
মধুসূদনের হায়, শুনে বুক ফেটে যায়
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ!

এ কবিতা শুনলে মধুসূদনের বুক ফাটতো কিনা জানিনে, তবে যখনই এই ক'টা লাইন মনে পড়ে তখনই আমাদের বুক বার বার ফেটে যায়—মধুসূদনের জন্যে নয়, নবীনচন্দ্রের জন্যে। এই রকমের বুক-ফাটানো কবিতা এবার ধীরে ধীরে কাগজে কাগজে প্রকাশিত হ'তে থাকবে—এজন্যে সকলের বুকে আগে থেকেই বল সঞ্চয় করা দরকার। যদি বুক ফাটেই, তবে একটু তৈরি অবস্থায় যেন ফাটে: অপ্রস্তুত অবস্থায় যেন বুকে এসে শেল না পড়ে। Don't Be Caught Unprepared—আমরা A. R. P.-ভাষায় সকলকে সাবধান হ'তে বলছি।

নাচঘর

সুশীল রায়, সম্পাদক

গোপাল ভৌমিক
সহঃ-সম্পাদক

ধীরেন ঘোষ
পরিচালক

ত্রয়োদশ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৮ | সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

একটি লোক

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত)

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বাসভবন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অঙ্কিত
রেখাচিত্র

উমা হৈমবতী

অশোকনাথ শাস্ত্রী

দেবাসুর-বিরোধ চিরন্তন। বহুযুগ পূর্ব্বে এইরূপ এক দেবাসুর-দ্বন্দ্বে সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পরমব্রহ্ম দেবতাদিগের পক্ষ হইয়া অসুরগণের পরাজয়ের হেতু হইয়াছিলেন। ব্রহ্মকর্ত্তৃক অযাচিতভাবে অনুগৃহীত এই অমরবৃন্দ ছিলেন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই তাঁহাদিগের বুঝিবার সামর্থ্য হইল না যে, তাঁহাদিগেরই অন্তরাত্মা ব্রহ্মের কৃপাই এ অসুর-সংগ্রাম-বিজয়ের মূল কারণ। ব্রহ্মনিমিত্ত জয়কে স্বকৃত জয় মনে করিয়া তাঁহারা অন্তরে অন্তরে বেশ একটু গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন কি, কেহ কেহ স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিলেন—'এ যুদ্ধজয়ের গরিমা ত' আমাদিগেরই নিজস্ব।

কিন্তু যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী সেই ব্রহ্মের নিকটে দেবকুলের এ অভিমান-অহঙ্কার চাপা রহিল না—অচিরেই ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি ত' রাগদ্বেষ-বিহীন—পক্ষপাতশূন্য। তাই তাঁহার ক্রোধ হইল না; বরং অজ্ঞ দেবগণের প্রতি অসীম করুণায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। দেবগণের এ মিথ্যা অভিমান—কর্ত্তৃত্ববোধের কারণভূত এ অজ্ঞান দূর করিবার জন্য তিনি এক অতি মহৎ পূজ্য (যক্ষ) রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। আত্মজ্ঞানবিহীন, বিচার-বিবেক-মূঢ় সুরমণ্ডলী তাঁহার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপদর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'তাই ত! এ যক্ষ কে!'

বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কাটিয়া যাইবার পর দেববৃন্দ অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'জাতবেদাঃ! এই দিব্য পুরুষটি কে তাহা জানিবার ভার তোমার উপর।'

'তথাস্তু।' অনন্তর অগ্নি সেই যক্ষের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

যক্ষের নিকট পৌঁছিতেই তিনি অগ্নিদেবকে প্রশ্ন করিলেন—'কে তুমি, দীপ্ত পুরুষ'?

'আমি অগ্নি—জাতবেদাঃ।'—

'বটে!'—যক্ষ আবার প্রশ্ন করিলেন—'কি শক্তি তোমার'?

উত্তর হইল—'পৃথিবীতে যত কিছু পদার্থ আছে, সবই আমি এক নিমেষে দগ্ধ করিতে পারি।'

'আচ্ছা, তাহা হইলে এইটি দগ্ধ কর দেখি'—বলিয়া যক্ষ এক গাছি তৃণ অগ্নির সম্মুখে ধরিলেন।

বিশ্বাবসুর ভাণ্ডারে যত তেজঃ ছিল, সে সকলের প্রয়োগ করিয়াও তিনি তৃণগাছটিকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। দগ্ধ করা দূরে থাকুক, উহা সামান্য বিবর্ণও হইল না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া দেবসমাজে ফিরিয়া আসিয়া শুষ্ক কণ্ঠে তিনি জানাইলেন, যক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করা তাঁহার শক্তির অতীত।

তখন ত্রিদিব-বাসিগণ বায়ুকে পরিবেষ্টন করিয়া বলিলেন—'বায়ু! এ যক্ষ কে—তাহা তোমাকেই জানিয়া আসিতে হইবে।'

'তথাস্তু'—বলিয়া বায়ুও ছুটিলেন যক্ষের দিকে।

যক্ষের সম্মুখস্থ হইতেই গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল—'কে তুমি?'

'আমি বায়ু-মাতরিশ্বা।'—

পুনরায় পূর্ব্ববৎ উদাত্তকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—'কি শক্তি তোমার?'

বায়ু উত্তর দিলেন—'পৃথিবীতে যত কিছু পদার্থ আছে, সবই আমি উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারি।'

'বটে! আচ্ছা!—এটা ওড়াও দেখি'—যক্ষ একগাছি তৃণ বায়ুর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

যত বেগ ছিল বায়ুর অধিকারে, সব নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তৃণগাছটি বারেকের তরেও বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুত হইল না তখন বায়ুদেবও অগ্নির মতই লজ্জায় অধোমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেবগোষ্ঠীতে নিবেদন করিলেন—'এ অদ্ভুত যক্ষের পরিচয় জানা আমার সামর্থ্যে কুলাইল না।'

দেবগণের বিস্ময় তখন চরমে উঠিয়াছিল। এবার স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের পালা। অমরবৃন্দ নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাঁহাকে অনুনয়পূর্ব্বক বলিলেন—'মঘবন্! এক তুমি ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নয় যে এ অদৃষ্টপূর্ব্ব অজ্ঞাতকুলশীল যক্ষের পরিচয় জানিতে পারে। তাই এবার তোমায় যেতেই হবে।'

ইন্দ্রও ঈষৎ চিন্তিতভাবে উত্তর দিলেন—'বেশ, তাহাই হইবে।' কিন্তু মুখে 'বেশ' বলিলেও তিনি কার্য্যতঃ অগ্রসর হইলেন ধীর পদক্ষেপে। যক্ষের সমীপস্থ হইতে না হইতেই তিনি ইন্দ্রের চক্ষুর সমক্ষেই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ইন্দ্র ছিলেন দেবরাজ—সর্ব্বদেবের প্রভু—সকলের অপেক্ষা অধিক শক্তিমান্। কিন্তু তাঁহার এ অতুলনীয় দৈবশক্তিও ব্রহ্মশক্তির নিকট কত তুচ্ছ, তাহা ভালরূপে জানাইয়া দিবার জন্যই যক্ষরূপী ব্রহ্ম ইন্দ্রের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে ইন্দ্র স্তব্ধ বিস্মিত চিন্তাকুল অবস্থায় সেই স্থলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহসা তাহার পুরোভাগে নির্ম্মল নীলাকাশপটে বহুশোভমানা এক দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। ইনিই উমা হৈমবতী। সসম্ভ্রমে প্রণত হইয়া দেবরাজ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—'দেবি! এ অন্তর্হিত যক্ষ কে?'

দেবী হৈমবতী সস্মিতবচনে উত্তর দিলেন—'দেবরাজ! সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ইনিই ব্রহ্ম। এ অসুর-বিজয়ের হেতুও ইনিই। ইঁহারই মহিমায় তোমরা আজ গৌরবান্বিত।'

তখন লজ্জিত—বিস্মিত কিন্তু লব্ধজ্ঞান দেবরাজ ইন্দ্র অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মই সব—ব্রহ্মশক্তিতেই সকলে শক্তিমান্!

কেনোপনিষদ্-বর্ণিত উমা হৈমবতীর এই অপরূপ উপাখ্যানটির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে অদ্বৈত-ভাষ্যকার ভগবৎপূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন—এই উমা হৈমবতী—হেমাভরণ-ভূষিতা পর্ব্বতরাজ-হিমবৎকন্যকা হরগেহিনী দেবী পার্ব্বতী। ইনিই মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা—সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের নিত্যা সহচরী।

দেবী দুর্গা যে বৈদিকী দেবতা—উপনিষদের এই উপাখ্যানটি তাহার অন্যতম প্রমাণ।

ভারতের প্রাকৃত সাহিত্য ও সাধনা

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতি যুগে যুগে দেশে দেশে, দুইটি বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন ভাষায় আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, তাহার অন্তরের সুখ-দুঃখের ইতিহাস, তাহার দৈনন্দিন জীবনের জীবন-চরিত, তাহার জীবন-সাধনার আলো-ছায়ার বিচিত্র চিত্র,—দুইটি বিভিন্ন পটে লিখিত ও অনুলিখিত হ'য়েছে; একটি হ'ল বিদগ্ধ-জনের সাহিত্যে, পণ্ডিতের লেখা সংস্কৃত ভাষার পুঁথিতে। আর একটি হ'ল, প্রাকৃতজনের নিরক্ষর মূর্খদের হাতে গড়া লোক-সাহিত্যে (folk literature) ও গণশিল্পে (folk-art)। ভারতের নানা দেশের নানা প্রদেশের নানা গ্রাম্য সাধন-কেন্দ্রে, বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার বিচিত্ররূপে, তাহার গ্রাম্যজীবনের সহজ সরল অভিব্যক্তির ইতিহাস, তাহার লৌকিক জীবনের আত্মচরিত লিপিবদ্ধ হয়েছে। যাঁরা কেবল সংস্কৃত ভাষার গণ্ডীর মধ্যে প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিদের প্রসিদ্ধ নাটক ও প্রসিদ্ধ কবিতায় ভারতের সাধনার মর্ম্মকথার অনুসন্ধান কর্ব্বেন, তাঁদের কাছে নিরক্ষর, অপণ্ডিত, প্রাকৃত ভাষায় লেখা প্রাকৃতজনের অকৃত্রিম মানসিকতার অনুশীলনের মধুর পরিচয় চিরকাল অজ্ঞাত ও অবিদিত থাকবে। ভারতে কোনকালেই অক্ষরে লিখিত পণ্ডিতের কেতাবী সাধনা বহুবিস্তৃত ছিল না। অথচ মূর্খ ও অপণ্ডিত, চাষী ও মজুর, ছুতোর কুমোর কামার, গোপকুল, কিরাত ও আভীর প্রভৃতি, ভারতের আদিম নিবাসী তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের জীবন-সাধনার একটা বিরাট ইতিহাস—তাহাদের প্রাকৃত-সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে। এবং এই প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস অতীব প্রাচীন। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ হ'তে আরম্ভ করে, আজও পর্য্যন্ত, কেতাবী বিদ্যার আভিজাত্য অস্বীকার করে, এড়িয়ে চলে, আমাদের দেশে নিরক্ষর জনসাধারণ চলিত ভাষার, গ্রাম্য ভাষার, প্রাকৃত ভাষার সহজ ও সরল পথে এক একটী বিপুল সাহিত্য রচনা করে চলেছে। গ্রাম্য-গীতে, চাষীর গানে, ছেলে ভুলোন ছড়ায়, ধান-ভাঙ্গার কবিতায়, পাখ্‌মারার গীতিকাব্যে, গোপালকের গোচারণের গানে, গোয়ালিনীর দোহনসংগীতে, শিকারীর আরণ্যক-রাগিণীতে, নাগরিক জীবনের বাহিরে, নানা বন্য ও গ্রাম্য গাথায় অশিক্ষিত তথাকথিত বর্ব্বর জাতির সরল জীবনের ইতিকথা মৌখিক ভাষার প্রাকৃত সাহিত্যে গানে ও গাথায়, চারণ-সঙ্গীত ও

ভজন-গীতিকায়, ছড়ায় স্বচ্ছন্দ ছন্দে লিপিবদ্ধ আছে! মানব জীবনের অতি প্রত্যুষকাল হইতে ইহাদের জন্ম। বহু শতাব্দী ধরে, মুখে মুখে এরা চলে এসেছে। হয়ত অনেক প্রাচীনকালের অতি বৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সাহিত্য হইতে এরা অনেক প্রবীণ ও বৃদ্ধ। অনেক সময় সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত কবিরা এই প্রাকৃত ভাষার কবিদের রচনা থেকে অনেক ভাব ও ভাবনা, অনেক রূপ ও ব্যঞ্জনা আত্মসাৎ করেছেন। পক্ষান্তরে, পণ্ডিতী সাহিত্যের অনেক ভাব ও ধারা, রূপ ও ব্যঞ্জনা লোক সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে এবং মধ্যযুগে, সংস্কৃত সাহিত্যে লিপিবদ্ধ পণ্ডিতগণের ভাব ও চিন্তার ধারা—নানা দেশে প্রচলিত নানা প্রাকৃত ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে। এইরূপে দেশে দেশে মনীষিগণের উচ্চ চিন্তার সাধনা ও শ্রেষ্ঠ ফল প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে, লোক-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, অতি নিম্নস্তরে আনীত ও প্রচলিত হয়েছে। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত এই লোক সাহিত্যের আদান প্রদান হয়েছে এবং অনেক সময় এই শক্তিমান, ঐশ্বর্য্যময়ী দেবভাষার দুর্জ্জয় প্রতাপে আমাদের লৌকিক সাহিত্য প্রভাবিত ও পরাভূত হয়েছে। তথাপি প্রাকৃত সাহিত্য তাহার জনপ্রিয় ক্ষেত্রে তাহার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা হারায় নাই। আপনার সহজ স্বাতন্ত্র অবলম্বন করে,—আপামর সাধারণের চিত্ত জয় করে, তাহার হৃদয়ে আসন পেতে চিরকালই বসে রয়েছে।

প্রাচীন প্রাকৃত ও লৌকিক সাহিত্যের মধুভাণ্ডে কত যে অমৃত সংগৃহীত ও লুক্কায়িত ছিল তাহার কিছু কিছু পরিচয় হালের সংগৃহীত "গাথা সপ্তশতী" নামীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাহারও মতে এই প্রাকৃত ভাষায় প্রাচীন গাথাগুলি খৃস্টের জন্মের পূর্ব্বে, কাহারও মতে খৃস্টের জন্মের পরের রচনা। খুব সম্ভবতঃ খৃস্টের পূর্ব্বে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, খৃস্টের পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। একটী গাথায় গোপাল ও গোপবধূদের একটী সুমধুর ও সুমিস্ট কথাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গোপ ও গোপ-গোপিনীরা সারি বেঁধে গোষ্ঠের দিকে চলেছে—প্রণয়ের রজ্জুতে গাঁথা ফুলের মালার মত, ধেনুর পাল তাড়িয়ে,—পথের ধুলো উড়িয়ে—সুন্দরী গোপ-ললনার উজ্জ্বল মুখ-মণ্ডল গাভীগণের পদোৎক্ষিপ্ত ধূলিতে ম্লান করে- তাহাদের সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব ও গৌরব হরণ করে, অথবা ধূলির আবরণে তাদের দীপ্ত সৌন্দর্য্যের প্রখরতা হরণ করে, আরও সুন্দর করে, গ্রাম্য পথকে আলো করে, গ্রাম্য পথের শোভা বর্দ্ধন করে চলেছে,—এই গোপ-গ্রামের শোভা যাত্রা। এই গ্রাম্য পথ-চারিণী ধূলি-মলিন গোপ-বধূ ও বল্লভীদের মালার মধ্যে চলেছেন—প্রেমের অবতার স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রত্যেক গোপবধূর তত্ত্বাবধান করতে করতে চলেছেন,—সকলের প্রতি তাঁহার কৃপা, সকলের প্রতি তাঁহার করুণা। কাহারও প্রতি কম-বেশী নাই। দরদী হৃদয়ের দরদ

সকলের প্রতি সমান। অথচ নজর যখন একজন গোপিনীর দিকে তখন সেই গাপিনী মনে মনে গর্ব্ব করছে—'আমার উপর দরদ অন্যের চেয়ে কিছু বেশী, সুতরাং সকলের চেয়ে আমার সৌভাগ্যই বেশী'। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই এই গর্ব্বিণীর গর্ব্ব খর্ব্ব করে' প্রেমিক আর একজন বল্লভীর গৌরব বাড়ালেন এবং পূর্ব্বের বল্লভীর মুখমণ্ডল দুঃখে মলিন হয়ে উঠল। এবং এই নূতন বল্লভীর মুখ প্রেমের আদরে, প্রেমের আলোকে দীপ্ত হয়ে উঠল। এই যে নূতন বল্লভী যার আদর বাড়িয়ে অন্যের সৌভাগ্য মলিন করলেন তাহার নাম রাধিকা। ধূলোর সঙ্গে ছিল বালি এবং বালির কণা পড়ল রাধিকার চোখে। সুতরাং চক্ষু-চিকিৎসার আবশ্যক হল। ফুঁ দিয়ে উড়াতে হল বালি। কৃষ্ণের মুখ-মারুত দ্বারা রাধিকার চক্ষের 'গো-রজ' (গাভীগণের পদদ্বারা উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণা) অপসারণ করার ছলনায়, রাধিকার মুখের সান্নিধ্যে চুম্বনের অভিনয় হল। এই সুমধুর লীলাভিনয় দ্বারা গোপীবল্লভ পূর্ব্বগামী অন্য বল্লভীদের (যাঁরা ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ প্রেমের একমাত্র অধিকারিণী বলে মনে মনে গর্ব্ব করছিলেন, তাঁদের) গর্ব্ব ও গৌরব হরণ করলেন। অর্থাৎ যাঁরা কৃষ্ণকে পেল না, কৃষ্ণের আদর পেলনা, তাহাদের মুখ অনাদরে, অপমানে, কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠল।

"মুহ-মারুএণ তং কহ্ণ গোরঅং রাহিআএ রবণেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অন্নাণঁ বি গোরঅং হরসি॥"
গাথা সপ্তশতী, ১।৮৯॥
(মুখ-মারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপয়ন্।
এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥)*

শ্রীমান প্রভবদেব মুখোপাধ্যায় উপরে উদ্ধৃত প্রাকৃত পদের বাঙ্গলা অনুবাদ করেছেন :—

'গোষ্ঠে ফিরিছে ক্লান্ত গাভীর দল,
ধরণীর ধূলি চরণ আঘাত লভি
গোধূলির বেশে ভরিল গগন তল,
গেরুয়া ছায়ার পিছনে হাসিছে রবি।
রাধিকা-মোহন সগোপিনী সেই ক্ষণে
লীলা কলরবে চলিছে আপন সুখে,

*টীকা। হে কৃষ্ণ, ত্বং মুখ মারুতেন রাধিকায়া গোরজঃ চক্ষু রজঃ অপনয়ন্। চক্ষু প্রবিষ্ট রজঃ অপনয়নছলেন চুম্বন্নিত্যর্থঃ। এতাসাং পুরোবর্ত্তিনীনাম্ অন্যাসামপি বল্লবীনাং গৌরবং হরসি। সৌভাগ্য গর্ব্ব খণ্ডনাদিতি ভাবঃ। যদ্বা গোরসং গৌরতাং হরসি। অপমানেন কৃষ্ণাকরণাদিতি ভাবঃ।

ধূলির মলিন রেণু ভাসি সমীরণে
মলিন লেপনী আঁকিল সবার মুখে।
ধূলির গুটিক কণিকা সহসা আসি
রাধার সরল আঁখিতে বাজিল হায়,
ব্যথার কমল নয়ন সলিলে ভাসি
সমবেদনার কিরণে ফুটিতে চায়।'

হাল প্রণীত "গাথা-সপ্তশতী"র ভাষা অনেকটা সংস্কৃত ভাষার কাছাকাছি। এই শ্রেণীর নানা প্রাকৃত ভাষা প্রদেশে প্রদেশে প্রচলিত ছিল। এবং তাহাদের বিভিন্ন রূপ ও নাম ছিল যথা 'সৌরসেনী'—'অর্দ্ধমাগধী' ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন শাখার প্রাকৃত ভাষা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হ'য়ে নানারূপের "অপভ্রংশ" চলিত ভাষায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। এই সব অপভ্রংশ বা বিভাষার মধ্যে প্রধান ছিল, 'ব্রাচট' বা 'ব্রাচড়' (আভিরী ভাষা) ও 'নাগর'। যেমন মহারাষ্ট্র প্রাকৃত থেকে মারাঠী ভাষা এবং মাগধী প্রাকৃত থেকে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি। সেইরূপ সম্ভবতঃ অপভ্রংশ 'ব্রাচট' ভাষা থেকে 'ব্রজ ভাষা' বা হিন্দীর উৎপত্তি হয়েছে। এই হিন্দীভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত ভারতের জনসাধারণকে এক চিন্তার, এক ভাবের, এক সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ ক'রেছে—এক সূত্রে বেঁধে এক ক'রে তুলেছে। সমগ্র ভারতে না হউক অন্ততঃ উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, ও পশ্চিম ভারতের অনেক অংশ, হিন্দী ভাষায় লিখিত ও কথিত সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়া, একই সভ্যতার ভাব ও চিন্তধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে, হিন্দুস্থানের হিন্দীভাষী ভারতকে ঐক্যতার মহিমায় সার্থক ক'রে তুলেছে। হিন্দী ভাষার সংস্কৃতির একটা বিশেষ মূল্য এই যে ইহা পণ্ডিত ও অপণ্ডিতের মধ্যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান ও ভেদের প্রাচীর ধূলিসাৎ ক'রছে।

সাহিত্যের গণতন্ত্রে জাতিভেদ নাই—উচ্চ নীচের বিচার নাই। হিন্দী ভাষা বিশেষরূপে আপামর সাধারণের সাধনার ভাষা। ভারতের মধ্য যুগে ধর্ম্ম সাধনার প্রধান বাহন ছিল এই হিন্দী ভাষা এবং কেবল ধর্ম্ম সাধনায় নহে, জীবন সাধনার সমস্ত রূপই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে হিন্দীভাষার মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। আপামর সাধারণের সুখদুঃখের ইতিহাস তাহার নিত্যজীবনের আনন্দের আস্বাদনের ইতিহাস, তাহার জীবনের সাফল্যের পরিচয়—হিন্দী সাহিত্যে অনেক পরিমাণে লিপিবদ্ধ আছে। "জো দিন যায় আনন্দমেঁ জীবন কা ফল সোই"। (যে দিন আনন্দে গেল তাহাতেই জীবনের সাফল্য)।

ভারতের ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে অনেক তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সাধক ধর্ম্মসাধনার পূণ্য ক্ষেত্রে আপন নিজস্ব সাধনার মন্দির গড়ে তুলেছেন। রামাইত সম্প্রদায়ের নানা

বিভিন্ন মত ও পথ আছে। ইহার মধ্যে রবিদাস প্রবর্ত্তিত 'রুইদাসী' সম্প্রদায় ভারতের শ্রীরাম পূজায় নূতন শক্তি সঞ্চারিত ক'রেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে পৌরাণিক ইতিকথা ও রামায়ণের প্রাচীন ঐতিহাসিকতার দূরত্ব হ'তে অতি নিকটে এনে বাস্তবিক করে' তুলেছিলেন রবিদাস। তাঁহার মতে শ্রীরামচন্দ্র কেবল রামায়ণের নায়ক নহে, কোনও প্রাচীন যুগের যুগাবতার মাত্র নহে—তিনি আজিও সর্ব্বঘটে মানুষের অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তর বিরাজমান। রবিদাসের সরল হিন্দী কবিতায় রবিদাস বলেছেন :—

"রাম কহত সব জগ ভুলানা সো য়হ রাম ন হোই
সব ঘট অংতর রমসি নিরংতর মৈঁ দেখন নহি জাঁনা ॥"

(সকল লোক যে রাম নামে ভুলিয়াছে আমার রাম সে রাম নহে। আমার 'রাম' সর্ব্বঘটে নিরন্তর বিরাজমান—আমি তাঁহাকে দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি)। রবিদাসের জন্ম কাশীর এক মুচি বা চামারের ঘরে। তিনি জুতা সেলাই করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন।

আর একজন চামার কবি ও সাধকের পরিচয় নিয়া এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করব। ইহাঁর নাম চিরঞ্জীব। ইনি অযোধ্যার অধিবাসী ছিলেন প্রায় ৩০, ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইনি দেহত্যাগ করেছেন। ইনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। রাধা-কৃষ্ণের 'কলহান্তরিত' বিচ্ছেদের প্রেমের একটী সুন্দর আলেখ্য কবিতায় লিখে গেছেন—এই আলেখ্যটী একজন কাংড়ার চিত্রশিল্পী তুলিকার রেখাবর্ণে ভাষান্তরিত করেছেন। চিত্রটী লাহোরের সরকারী যাদুঘরে আছে। তাহার একটী প্রতিলিপি সামনের পাতায় ছাপা হল। চামার কবিতার ভাব ও কথার প্রতিধ্বনি ও সরস অনুবাদ এই চিত্রে অপূর্ব্ব রসের মূর্ত্তিতে অনুলিখিত হয়েছে।

এখানে শ্রীরাধিকা "কলহান্তরিতা" বা "অভিসন্ধিতা নায়িকার" ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছেন। ষোড়শ শতকের বিখ্যাত হিন্দী কবি কেশব-দাস তাঁহার "রসিক প্রিয়ার" রসের অভিধানে "অভিসন্ধিতার" লক্ষণ ধরে দিয়েছেন :—

"মান মানাবত হুঁ করে মানদকো অপমান।
দুনো দুখ্‌তা বিনা লহে, অভিসন্ধিতা বাখান্ ॥"

তাকেই বলে "অভিসন্ধিতা", নায়িকার প্রেমকে সম্মান যিনি দিয়েছেন, সেই মানের দাতা প্রিয়তমের প্রীতি প্রত্যাখান করে, তাঁকে অপমান করে বিদায় দিয়ে, পরে অনুতাপের দ্বিগুণ দুঃখে যিনি পীড়িত হন।

চামার কবি চিরঞ্জীব ভক্তের হৃদয় দিয়ে, রসের অনুভূতি দিয়ে, হিন্দী ভাষার সহজ কথায় চিত্রটী সুন্দর রসে ও বর্ণে ফুটিয়ে তুলেছেন :—

"আয়ে লালা কহুঁতে গৃহমেঁ, জিন্‌কে মৈ উমংগমে মান দিখায়ো
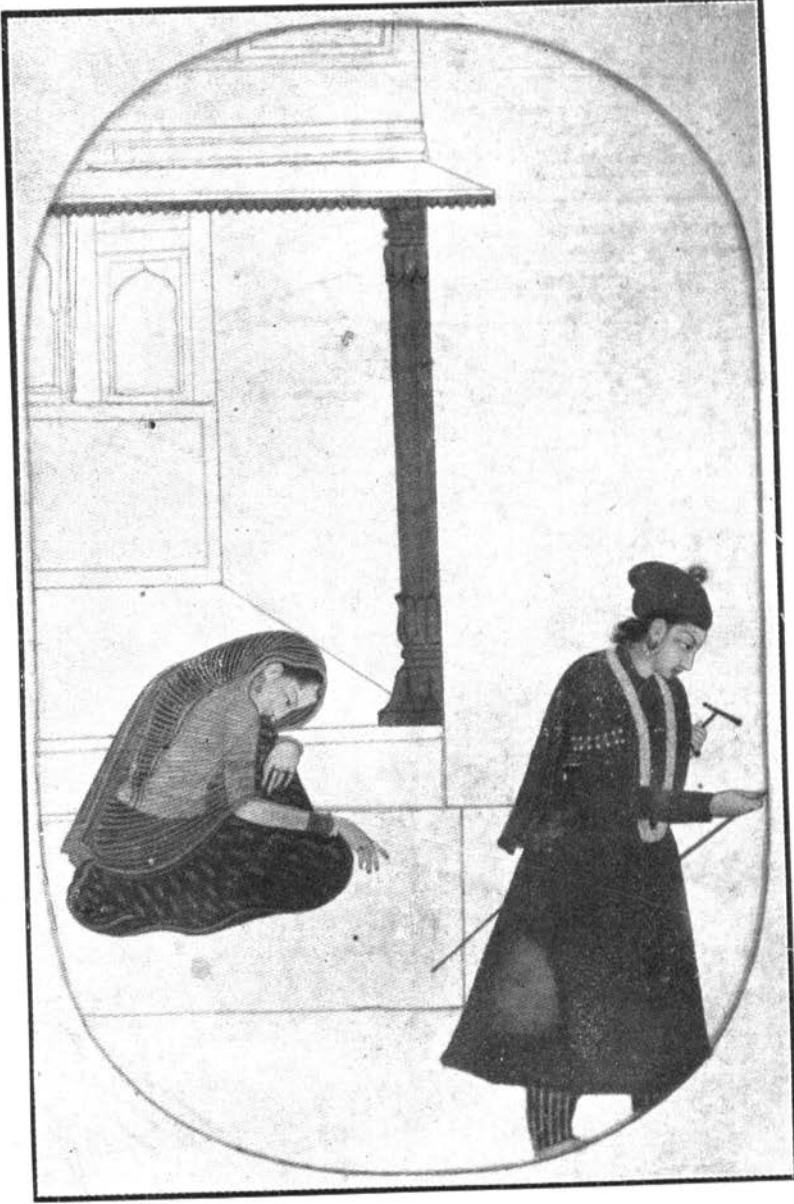
ওল্ড মাস্টার অঙ্কিত
কাঙড়া স্কুল

রাধাকৃষ্ণ
কলহান্তরিত বিচ্ছেদ

রুঠি কৈ ঠাড়ে ভয়ে ইত্‌নে পৈ তউ ন উনহেঁ কর থাংভি বিঠায়ো।
কাহ কহুঁ আপ্‌নী মতিকো চিরং-জীবিজু প্রীতমকো ন মনায়ো
লাজকে কাজ অরী সজনী, আপ্‌নে অনুরাগমে দাগ্ লগায়ো ॥"

লালা (শ্রীকৃষ্ণ) যখন তাঁহার অন্য কোনও প্রণয়িনীর গৃহ থেকে আমার গৃহে ফিরে এলেন, আমি তাঁকে প্রচণ্ড কোপে উত্তপ্ত করে, দুর্জ্জয় মানের বিষধারায় অভিষিক্ত করে অপমান কল্লেন, তিনি রাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু, হায় সখি, আমার কি দুর্ম্মতি হল, আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করে তাঁকে বসালেম না; তিনি ক্রোধভরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমার দুর্ম্মতিকে আমি কি বলে গালি দিব, কেন আমি আমার চিরঞ্জীব প্রিয়তমের ক্রোধ শান্ত করলাম না—রাগের ভরে, হায় সজনি! কৃষ্ণ প্রীতির নির্ম্মল অনুরাগের উপর কলঙ্কের দাগ লাগিয়ে আমি অপরাধিনী হয়েছি।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবি সনাতন গোস্বামীর একটী পদে এই আক্ষেপ উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়:—

"হন্ত! সনাতন গুণ-মভিজান্তম্।
কিম-ধারয়মপি উরসি ন কান্তম্ ॥"

সিদ্ধজী

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়ের গায়ে কালো কালো দাগ, তা দূর থেকে দেখায় যেন বসুধারা, খুব উঁচু থেকে, নীচে থেকে দেখতে কালো কালো বেশ চওড়া ধারাগুলি সোজাসুজি নেমে একেবারেই নীচে পাথরস্তূপের গায়ে পড়েচে। আমার সঙ্গে ছিল একটি অল্প বয়স্ক সাধু,—দক্ষিণ দেশের লোক কিন্তু অনেক জায়গায় ঘুরেচে এই উত্তরাখণ্ডে। তাকে জিজ্ঞাসা করবার আগেই বললে,—

ই'য়ে বো দেখো শিলাজিৎ—

একটা গন্ধও আছে,—বলে কপিমুত্রবৎ গন্ধ হয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে। অপ্রিয় গন্ধটা। কিন্তু একটুও সংগ্রহ করবার যো নেই পাথরের সঙ্গে ধুলায়, কাকরে এমন ভাবে মিশে গেছে, ওর মধ্যে কিছু সার পদার্থ যে আছে—তা কে বুঝবে?

খানিকটা আরও যেতে হবে, তবে বিশ্রামের স্থান। চলতে চলতে একটা ছোট ঝরণা, ঝির ঝির করে সামান্য জল, তোড় নেই,—উপর দিকটা গাছপালায় ঢাকা, আর নীচে জল-বিচুটির জঙ্গল।

হন হন করেই চলেছি আমরা। কয়েকজন শ্রমজীবী বাঁ হাতে ঘিয়ের ভাড়, ডান হাতে লাঠি; তার শেষ দিকে একটী বোঝা ঝুলচে, তারা আসছিল।

বেরীনাগ কত দূর? জিজ্ঞাসার উত্তরে বোললে, ছুসরে চড়াই। অর্থাৎ আরও একটা চড়াই পরে। সন্ধ্যার আগেই আমরা যাতে সেথায় পৌঁছে যেতে পারি, এমনই সংকল্প করে জোর জোর পা চালালাম।

এবার সঙ্গী সাধুটি অনেকটা পিছনেই পড়েচে। সুমুখেই দেখি, এক বাঁকের মুখ ঘুরে একটি ঝরণা—বেশ বড় ঝরণাটি। সেই ঝরণার নীচে, জলের গতিভঙ্গে যেন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেচে। খানেক এগিয়ে আরও কাছ থেকে ভাল করে দেখতে দেখতে অনেকটাই চললাম;—বড় কাছে নয় আরও খানিক চলতে হবে তবে ওকে পাওয়া যাবে সুবিধামত দৃশ্যের মধ্যে। পথ থেকে নামলাম। আবার এসে ওঠা যাবে,—পথ ত পড়েই আছে, হারাবার ভয় নেই এখানে। ভরসা ছিল খুব, তাই অত জোর করে চলতে

পেরেছিলাম। আরও একটু আরও একটু করে করে পথ ছেড়ে অনেকটাই নেমে চলেছি; এক একবার পিছন ফিরে দেখচি কতটা বিপথে এসেছি, সুমুখে মুক্ত জলপ্রপাতের মোহে চলেছিলাম। এইবার পিছন ফিরে দেখি, সঙ্গী সাধু এসে পথে দাঁড়িয়েছে, আমায় দেখতে পেয়েছে কি না জানি না,—বোধ হল সে ঝরণার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে।

আমি এখন বুঝলাম, যে স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করতে আমি এগিয়ে চলেছি, ঠিকমত জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে খানিকক্ষণ ভাল করে' দেখব মনে করে চলেছি,—সেখানে যাওয়ার ঠিক অর্থ ঐ প্রপাতের কাছেই যাওয়া।—মন্ত্রমুগ্ধের মতই চলেছি, মনেই নেই যে আজ সন্ধ্যার আগে বেরীনাগ শৃঙ্গে উঠতে হবে।—এখন আমি যে ক্রমে নেমে চলেছি আমার ভবিষ্যত পথের চড়াই বাড়চে একথা মনেই নেই। আনন্দ বা কুসুমের নেশায় চলেছি সামনে, ঐ যে,—আর খানিকটা, নামা উঠা করতে করতে সেই ঝরণার মনোহর দৃশ্য সামনে আর নেই! এবার খানিকটা ঘুরে আবার একটু উঠলেই দেখতে পাবো এই মনে করে চললাম।

একটা প্রকাণ্ড গহ্বর,—তার বাইরে, বড় পাথর তিন চারটে রেখে যেমন চুলা তৈরী করে সেই রকম দু' তিনটে চুলা আর পোড়া কয়লা ছাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত,—পোড়াকাঠ দু'চার টুকরো পড়ে আছে—এদিকে ওদিকে। এখানে মানুষ ছিল সম্প্রতি তারই লক্ষণ। গুহার ভিতরটা অন্ধকার খানিকটা তফাৎ থেকেই দেখছি কালো মিস মিস করচে, প্রায় তিন হাত উচু হবে প্রবেশ দ্বার। এ আবার কোথা এলাম। ঝরণারও কোন চিহ্নই নাই।

একটু খানিক উঠলে তবে গুহার মধ্যে ঢোকা যাবে: কিন্তু গুহায় ঢুকতে যাব কেন? মানুষ ত ওর মধ্যে নেই তা স্বভাবতই মনে হচ্ছে। যদি কোন হিংস্র জন্তু থাকে? কাজ কি উদ্দিষ্ট পথেই যাওয়া যাক। এই ভেবে পা চালি দিলাম। কিন্তু দোলায়মান উদভ্রান্ত মন ছোঁক ছোঁক করচে ঐ গুহার মধ্যে না জানি কি রত্ন থাকতে পারে তারি উদ্দেশে যাবার জন্য। কাজেই আবার ফিরে গুহার দিকেই চলতে লাগলো আমার অক্লান্ত পা দুখানি, গুহার ঠিক সুমুখে গিয়ে কিন্তু এমনই কিছু আরও দেখলাম যাতে মনে হোলো এখানে এসে বোকামি করিনি। দেখলাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঐ গুহাদ্বার যেন মানুষের হাতের যত্ন আর চেষ্টার ফলে ধূলিশূন্য, আর ঠিক প্রবেশ পথের উপরেই একখানি খড়গ ঝোলানো যা প্রথমে দেখা যায় নি। এ বস্তুটির উপর লক্ষ পড়তেই এখানে মানুষ থাকে যেমন বুঝা গেল তেমনি একটু ভয়ও হোলো—এমন পবিত্র স্থানে খড়গ কেন?

ঐ খড়গ দেখেই যেন গুহায় প্রবেশ-নিষেধ মনে হোলো, স্বতই একটা যেন প্রতিবাদ, গুহার যিনি অধিকারী ঐটেই তাঁর নির্দ্দেশ বাইরের কোন আগন্তুকের প্রতি, কাজেই বাইরে দাঁড়িয়েই চিন্তিত মনে ভিতরের দিকে চেয়েই রইলাম। এমন অবস্থায়

ফিরে যাবার আগেই একবার এখানে কে আছে বা থাকে না জেনে তো যাওয়া যায় না :—তাই একবার পরিমিত চীৎকার করে দেখতে ক্ষতি কি? কে আছে ভিতরে?—এই কথা বোলে। কিন্তু চেঁচাতে আমায় হোলো না,—এদিক ওদিক চাইতে সুমুখেই পথ থেকে ধীরে ধীরে উঠছে একটি মূর্ত্তি,—মাথায় দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, উলঙ্গ নর, গলা থেকে বুকটুকু নগ্ন;—কটি দেশে একখণ্ড বস্ত্র জড়িত জানুর উর্দ্ধেই তা শেষ হয়েছে। গৌরবর্ণ সুকুমার মুখাকৃতি গোঁফ দাঁড়ির রেখা পর্য্যন্ত নাই; দক্ষিণ হাতে ভারী জলের পাত্র। কমণ্ডলু নয়। আমায় দেখেই,—প্রসন্ন মনে, যেন কৃতার্থ হয়েছে এমনই ভাবে, আইয়ে, ঠেরিয়ে বোলে,—সামনের চত্তরের মত স্থানটিতে জলভার নামিয়ে রাখলে। আমার আনন্দ হোলো একজন নূতন মানুষ পেয়ে, পরক্ষণেই একটু দুঃখও হোলো এই ভেবে—যে, হয়ত সঙ্গী ছাড়া হলাম এখানে এসে। আরও ভেবে দেখলাম, আজ আর বেরীনাগ যাওয়া হবে না;—কারণ আমার নিয়ম ছিল নূতন কোন সাধু সঙ্গী পেলে, তার সঙ্গে একটু প্রাণ খুলে পরিচয় যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ স্থান ত্যাগ নিষিদ্ধ।

যিনি এই গুহায় বাস করেন ঐ যে সাধুমূর্ত্তি বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যেই হবে। এক রকম খোসা মাকুন্দ, বেশ শ্মশ্রুহীন মুখ দেখা যায় সেই রকম। এমন কি তার ভ্রূও এত কম যে নেই বললেই যেন হয়, তার উপর বড় বড় চক্ষু দুটি ভয়ঙ্কর দেখায়। লোম নেই। হিন্দী কথা তার ঠিক ঐ দেশীয় লোকের মত। আমায় বসতে বলে তিনি গুহার মধ্যে প্রবেশ করলে মাথাটি নীচু করে তারপর বেরিয়ে এলেন। একটি লোটা হাতে করে।

আমি একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সুমুখের ঐ বড় ঝরণা থেকে জল আনবেন?

তিনি বললেন, বো তো বহোত দূর, থোড়া নীচে ওর ধারা হৈ, উহাঁসে লায়া।

আমার প্রথম অনুমানমূলক মনোভাব এক কথায় ঐ সাধুর সম্বন্ধে ধারণা তেমন সম্পূর্ণ প্রীতিকর হয় নি। ঐ যে ভ্রূহীন চক্ষু তার, বোধ হয় সেইটাই আসলে বিরুদ্ধ ভাবেই ক্রিয়া করেছিল মনের মধ্যে। সেই ভাবটি বদ্ধমূল হল যখন একটি নারী—কোলে তার একটি ছোট্ট চার পাঁচ মাসের শিশু—হঠাৎ সেই গুহার দক্ষিণ দিক থেকে এসে উপস্থিত হল আমার সুমুখেই, আর আমাকে দেখেই কেমন একটা অস্বস্তি প্রকাশ পেল তার মুখে। সেই নারী যুবতী, অপরূপ সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু তাম্রাভ উজ্জ্বল শ্যাম মূর্ত্তি তাকে গৌরবর্ণও বলা যায়,—মুখশ্রী অতীব সুন্দর; অবিন্যস্ত ঘন চুলে দীর্ঘ বেণী, ঘাগরা পরা বুকে উড়না,—মাথায় কাপড় নেই, যেন অভ্যস্থ গৃহস্থালীর মধ্যে কর্ম্মেরত একটি নবীন

গৃহিণী। শিশুটি কোলে চঞ্চলভাবে হাত পা নাড়ছিল, খুব হৃষ্ট পুষ্ট বলবান গৌরব শিশু নীল দুটি চক্ষু,—কিন্তু ঐ রকমই ভ্রূহীন, মুখখানি ঐ সাধুটির অনুরূপ।

অল্পক্ষণের মধ্যে এই সকল ব্যাপার যেটা ঘটলো তাতে আমর মধ্যে, কিং কর্ত্তব্য এ ক্ষেত্রে, কি আমার করা উচিত এইটিই মনের মধ্যে তোলাপাড়া চলেছে, কোন মীমাংসায় আসতে পারিনি। মেয়েটি তার সঙ্কোচ শীঘ্রই সামলে নিলে,—সে এগিয়ে আমার সামনে এসে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে,—আপ কী বাঙ্গালী শরীর ?—জী হাঁ, বোলে আমি তার অসাধারণ আত্মসংযমের প্রশংসা না করে পারিনি। একবার কোলের ছেলে, আর একবার মায়ের মুখের দিকে দেখছিলাম,—যেন মনের অজ্ঞাতসারেই দেখলাম যে মায়ের ডান দিকের ভ্রুর উপরে একটা কাটা দাগ—সেটা সম্প্রতিই আরোগ্য হয়েচে বোধ হল। আমার ঐ দিকে দেখা মেয়েটি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে,—সে তখন সাধুটির উদ্দেশে বললে ;— সিদ্ধ জি ! আপকা দেশকী মূত্তি হৈ, কি নহি ?—

ক্যা মালুম, মৈনে অভিতক কুছ তো পুছান হী অবহি তুরন্ত মিলা, না !

তখন,—আমাকে বৈঠিয়ে তারপর সিদ্ধজীকে এক আসন তো দেও। বোলে সেই চত্তরের দিকে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে, প্রফুল্ল মুখে আমার দিকে চেয়ে রইল। দেখছিল বোধ হয় বাঙ্গালী সাধু আর একজন কেমন।

সিদ্ধজী দুখানা মৃগচর্ম্ম বার করেছিলেন, একখানি আমার দিকে দিয়ে অপরখানি একটু দূরে ছুঁড়ে দিলেন। তাঁর মুখখানা বড় গম্ভীর,—যাঁকে আমরা গোমরা বলি সে রকম হয়ে গেল। আমি বসলাম বটে, আর মেয়েটির সপ্রতিভ ভাব দেখে কতকটা সঙ্কোচ কাটাতে পারলেও অন্তরে ঐ গোমড়া মুখখানার জন্য একটু বিব্রত বোধ করলাম। তারপর যখন আমায় ভাগাবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধজী, হিন্দিতে নয় এবারে বাঙ্গলায় বললেন, এখান থেকে একটু সকাল সকাল না উঠলে সন্ধ্যার আগে বেরীনাগ পৌঁছাতে পারবেন না ,— তখন অন্তরে একটা কি রকম আঘাত অনুভব করলাম। আমার যাওয়াই দরকার, এখানে রাত্রবাস অসম্ভব, একথা আমার মধ্যে উঠলেও যেন এতক্ষণ চাপা ছিল।

মেয়েটি কিন্তু একেবারে নিঃসঙ্কোচেই সিদ্ধজীর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আর হিন্দি না বলে বাঙ্গলায় আপন ভাষায় বলছি। তুমি কি এঁকে চলে যাবার কথা বলচ ?

হাঁ, একটু সময় থাকতে না বেরুলে, -

কেন সময় থাকতে বেরুতে যাবেন উনি ? আজ আমাদের এখানে থাকবেন না ?

না, উনি থাকবেন না,—আমি জানি।

থাকতে অনুরোধ করেছিলে ?

না, যখন জানি বৃথা কেন অনুরোধ করব ?

না, তুমি ওঁকে থাকতে বলো, আমাদের বলা উচিৎ—আমরা কতদিন একলা আছি আজ যদি ভগবনের ইচ্ছায় একজন এসেছেন ; মেয়েটি যেন বেশ অনুযোগের সুরেই বললে, তাকে ভাগাবার চেষ্টা কেন !

সিদ্ধজি হয়ত আশা করেন নি যে মেয়েটি এতটা আগ্রহ প্রকাশ করবে আমাকে রাখতে। কাজেই বাধ্য হয়েই যেন আমার কাছে এসে পরিষ্কার বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ;—আমাদের এখানে আজ থাকবেন কি ?

আমি তখন সকল কথা বললাম। বেরীনাগের পথে যেতে যেতে ঐ সুদৃশ্য প্রপাতটি দেখেই এদিকে এসে পড়েছি,—ধারণা ছিল যে ওটা খুব কাছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এতটা এসে দেখি আরও অনেকটা দূরে, তারপর আপনাদের গুহাটি চখে পড়লো, তাই এসেছি। এখন বিদায় দিন চলে যাই। এখন না উঠলে সন্ধ্যার মধ্যে বেরীনাগে পৌঁছাতে পারবো কি ?

কোন বিশেষ কাজ সেখানে যদি না থাকে তবে আজ আমাদের আশ্রমে অতিথি হলে ক্ষতি কি ?

দেখুন, আমার ইচ্ছা ছিল, এখনও আমার এখানে কিছুই দেখা হয়নি ; তা ছাড়া ঐ সুন্দর জলপ্রপাত না দেখে এখনও আমি যাবো না। যদি এখানে সুবিধা না হয় তাহলে আমার যেখানে সেখানে পড়ে থাকার অভ্যাস আছে আজ রাতটা কোথাও কাটিয়ে সব দেখে শুনে কাল চলে যাবো।

তখন সেই মেয়েটি, বোধ হয় সব কিছু শুনে, একটা ধারণা করে—আমায় বললে, আজ ইহাঁ রহযানা সাধুজী। কুত কতলিফ না সমঝো, হরজা ন হো ত রহে যাও ; হামলোক—একেলা। তখন আমি তাকে আবার বুঝিয়ে দিলাম, এখানে থাকতে আমার আপত্তি নেই, ঐ ঝরণা দেখতে এসেছি, এখানে থাকলে আমার কোন অসুবিধাই নেই যদি অসুবিধা হয় তো সে আপনাদের।

যাই হোক আমার সম্মতি পেয়ে মেয়েটি সুখী হল, আমিও ঘাড় থেকে কম্বলখানা নামিয়ে রাখলাম, লোটা আর লাঠিটা আগেই রেখেছিলাম। এখন বললাম, আমি একটু ঘুরে দেখে আসি ঐ ঝরণাটা এখান থেকে কত দূর। মেয়েটি বললে, ঐ কালী ঝোরা ? না, ওখানে আজ যাওয়া হবে না। ওটা কাছে নয়' পৌঁছাতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আপনি কাছে পিঠে কোথাও যান, তবে বেশী দেরী করবেন না,—সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগেই আসা ভালো, এখানে ভয়ের কারণ আছে।

পরে জেনেছিলাম, বাঘ আর সাপও বটে এখানকার ভয়। আরও একটা

ভয় আছে সেটা দিনেও যেমন রাতেও তেমন;—সেটা হলো বিচ্ছু। সে বিচ্ছুর চেহারা আমাদের দেশের কারো ধারণা নেই মিশ মিশে কালো চকচক করচে, তিন ইঞ্চি লম্বা, পিছনের হুলটী উপর দিকে যখন গুটিয়ে রাখে তখন ছোট দেখায়। কেউটে সাপের মতই তার বিষ প্রাণঘাতী, সে তীব্র বিষের প্রতিকার নেই, শুনেছি কেউ কেউ যারা প্রতিষেধক জড়ি বুটি জানেন তাদের পাওয়াও ভাগ্যের কথা। মেয়েটির মুখেই এই সব কথাই শুনলাম সিদ্ধজী কতক্ষণ কাজে রইলেন, পরে মেয়েটি আমারি কাছে এই সব বলে সাবধান করে আমায় ছেড়ে দিলে।

মা, শিশু ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে বসে এমনভাবে একজন অপিরিচিত লোকের সঙ্গে সহজ আন্তরিকতাপূর্ণ সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা কইলে এরকম আগে কোথাও প্রত্যক্ষ করিনি। বাঙ্গালির উপর তার শ্রদ্ধা অসীম যেন তার নিজেরই জাতি।

ওখান থেকে বেরিয়ে যে দিকে ঝরণা ঠিক সেই দিক অনুমান করেই চললাম। খানিক উঠানামার পর আবার সেই মুক্ত জলপ্রপাতটি সামনেই দেখা গেল। আঃ, কি আনন্দই ছিল তার মধ্যে! একটা শিলার উপরে বসেছিলাম। দেখচি আর মনে মনে একবার হিসাবও করছি যে এটা কতদূর হওয়া সম্ভব? ঠিক মনে হয় ঐ তো সামনেই, বড় জোর একপোয়া পথ—একেবারে ঠিক সোজা ত যাওয়া যাবে না? এই বন্ধুর পর্ব্বত প্রদেশে দেখায় ঐ রকমই কিন্তু সিদ্ধজী ত বলেন অনেক দূর,—আজ গেলে পৌঁছাতেই সন্ধ্যা হবে, ফিরে আসার কথায় কাজ নেই। ইচ্ছা হয় এখানে একটি কুঁড়ে বেঁধে—সারাজীবন কাটিয়ে দি। সিদ্ধজী কেন যে এমন দৃশ্যটিকে ছেড়ে—এর আড়ালে ঘর করলেন! বোধ হয় পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতির তৈরী গুহাটি পেয়ে—না হলে আর কি কারণ হতে পারে।

খানিকটা নীচেই ঐ স্রোতটা চলেছে, শব্দ পাওয়া যাচ্চে,—সেই শব্দের মধ্যে মোহিনী শক্তি আছে, শুনতে শুনতে তন্ময়তা আসে। তার গতিবেগ এমনই প্রখর—খানিক চেয়ে থাকলে মনে হয় আমায় যেন তার সঙ্গে নিয়ে চলেচে। —

এখন, ছবি আঁকবার সরঞ্জাম কিছুই সঙ্গে নেই, দুঃখও নেই তাতে। কারণ সত্য বলতে এসব দৃশ্য আঁকার কাজে মনকে ছলনা করতে হয়, তারপর—শেষ অবধি প্রকৃতির এই মহান্ সৃষ্টির সম্পূর্ণরূপ রেখা ও বর্ণ বিলাসের কথা দূরে থাক,—শত ভাগের এক ভাগও হয় কি না সন্দেহ; কেবল মাত্র একটা আংশিক পরিচয় দিয়েই লোকের কাছে মহত্তর পুরস্কারের দাবী করা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি? মনে হয় যেন পাতক। আজ যদি আমি শিল্পী হয়ে, সব কিছু সরঞ্জাম নিয়ে, এখানে ঐ দৃশ্যের প্রতিচ্ছবির কাজে আমার সকল উদ্যম, উৎসাহ নিয়োজিত করতাম তা হলে, আমি নিশ্চিত বলতে পারি এই মহান

দৃশ্যটি এমন গভীর ভাবে উপভোগ করতে পারতাম না। উপভোগ কথাটা ঠিক নয়, গ্রহণ, বা অনুভব, এই দুইটিই ঠিক্। উপ শব্দযুক্ত কথাগুলির মধ্যে যে ভাব থাকে আমার মন তার পক্ষপাতি নয় উপ শব্দটাই যেন প্রবঞ্চনাময়—

সুধু দৃশ্যটুকু নয়, তার সঙ্গে যে নিস্তব্ধভাবটি আর জলোচ্ছ্বাসের একটা অপূর্ব্ব গুরুগম্ভীর রোল, দূর নিকট ব্যবধানহেতু তারও তারতম্য আছে এসব নিয়ে যে বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয় পথের মধ্যে দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে আর সেই ভাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অহম্ সত্তাকে অপরূপ সুখের হিল্লোলে নাচায়, তার কি বর্ণনা আছে? আঁকতে গেলে তার অনেক অংশই বাকী থেকে যায় যে আঁকে তার কাছে। যে দেখে তাকেও অনেকটা কল্পনা করে নিতে হয়।

একটি সুখকর কিছু পেলে প্রিয়জনের সঙ্গে এক হয়ে ভোগের ইচ্ছাটি যেন মানুষের স্বভাবের গুণ বা জীব ধর্ম্ম; তারপর যে বস্তু আমার সঙ্গে আমার প্রিয়জনের ভোগের সম্ভাবনা নেই,—সেখানে কথায় বলে ক্ষোভ মেটানো,—এতে পূর্ণ সুখ পাওয়া ত যায়ই না বরং অক্ষম চেষ্টা মনে বুঝতে পারলেও তা না করেও যেন থাকা যায় না। বাক্ আমাদের সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু এই স্থান বা দৃশ্যের বৈচিত্র না প্রকাশ করেও থাকা যায় না আপন জনের কাছে।

এখানে চীড়গাছ আছে তবে আলমোড়া অঞ্চলের মত ঘন নয়, আর অতটা পুষ্টও নয়, অতটা দীর্ঘও নয়। সেই পাইনফরেস্টের গন্ধও নেই তত, কিন্তু এখানে আর একটি গল্প আছে, যা চমৎকার। বড় বড় শ্যাওলা ধরা পাথরের আসে পাশে ছোট ছোট একরকমের গাছ, তার পাতাও বিচিত্র লম্বা নয় যেন পদ্মপাতার ক্ষুদ্র সংস্করণ, তাতে বিরল ছোট ছোট লাল আর হলদে ফুল যেন কুঁদ ফুলের মত। সে ফুলে একরকম গন্ধ আছে, মৌমাছিও বসে কিন্তু তার আকর্ষণ নেই। তারপর তুলসী পাতার গড়ন, আকারে প্রায় দ্বিগুণ বড় একটা গোলাপ পাতা, খুব পুরু পুরু পাতা ডাঁটা সরু সরু, আর স্বচ্ছ যেন একটু ঘোলাটে কাঁচের নল, মাঝখানে লাল সুতার মত একটা রেখা। গোড়ার দিকে চমৎকার সবুজ আভাযুক্ত, পেঁপের ডালের মত, ঐ রকমই মোটা, দেখতেও অনেকটা দুহাত আড়াই হাত জঙ্গলীগাছ তার ঐ পাতা থেকে একটা গন্ধ পাওয়া যায় খানিকক্ষণ সেখানে থাকলে নেশার মতই একটা মাদকতা এসে বেশ মাতোয়ারা করে তোলে।

দূরে কাছে এই সব অনেক কিছু নয়ন বিমোহন দেখতে দেখতে উঠবার কথা আর মনেই থাকে না। কিন্তু সুমুখেই আকাশে সন্ধ্যা নেমে আসে। সন্ধ্যা হোলো, এবার উঠতে হবে। আজ এক নূতন ঘরে অতিথি। ঐ মেয়েটির কথা মনে হোলো

তখন। কি জানি কেন? সিদ্ধজীর সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথাটা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যায়। আজ নিশ্চয়ই এদের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে—অন্ততঃ আশা আছে, জানতে পারবো।

আমার ওখানে থাকতে ইচ্ছা ছিল না, একটা কৌতুহলই মনে কাজ করেচে সাধু হয়ে বেরিয়ে এসে আবার সংসার করা গৈরিক পরে এ যে ব্যাভিচার, বিসদৃশ ব্যাপার এ সব জেনেও আমার এখানে থাকা ঘটলো কেন? ঐ নারীর প্রভাব যে এর সঙ্গে আছে তাতে আর সন্দেহ মাত্র নেই; তবে সবটাই তা নয় এটাও সত্য।

এক অবধূতের সঙ্গে আমার কিছু দিন সঙ্গ হয়েছিল,—তিনি অসাধারণ মানুষ। তিনি বোলতেন,

১। ইমলি খায়কে লাগায় ধ্যান, ২। গৃহী হোয়কে বাতায় জ্ঞেয়ান।
৩। যোগী হোয়কে কোটে ভগ্, ৪। ইয়ে সব আদমী কলিকা ঠগ্।

এ সুধু এখনকার কথা নয় প্রাচীন কাল থেকেই এ ভাবের ব্যাপার সাধু সম্প্রদায়ে মধ্যে চলচে,—কত কত উপজাতির সৃষ্টি হয়েচে এই থেকে। তার সংখ্যা নেই। এই সব থেকেই আমাদের সমাজে অনেক সাধু, ব্রহ্মচারী, গিরী, পুরী ইত্যাদি পদবীর উদ্ভব হয়েচে। অনেক জনার পথভ্রষ্ট অবস্থা, জারজ সন্তানকে শিষ্য বোলে প্রচার করা,—এ সব দেখা আছে প্রথম থেকেই;—পরে যখন, সমাজের সঙ্গে মিশে যায় তখন আর মোটেই বিসদৃশ লাগে না,—কিন্তু প্রথম অবস্থায়—? সমাজের বাইরে থেকেই যেন একটা বিধি বহির্ভূত কাজ করিয়ে প্রকৃতি এদের সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। অদ্ভুত আমাদের এই সমাজের ইতিহাস আর তার তত্ত্ব কথা।

সন্ধ্যার একটু আগেই উঠতে হ'ল,—আমার আজকার আশ্রয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এসে মেয়েটিকেই দেখলাম চত্তরে,—কোলে ছেলেটি ঘুমিয়েছে পাশেই একখানি আসনের উপর একটু বিছানার মত মাথার একখানি কাপড় পাটকরা শিশুর বালিসের কাজ করছে। আমায় দেখেই;—আইয়ে আইয়ে বোলে সম্ভাষণ করে সে ছেলেটিকে শয্যায় শুইয়ে দিলে। দিয়েই উঠলো,—ঐ উঠবার সময়েই দেখলাম, তার চক্ষে যেন জল,—কেঁদেছে মনে হোলো। সিদ্ধবাবা সেখানে নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবাজী কোথা?—কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল গুহার পাশেই। আমায় যেন ঐ শিশুটিকে দেখবার ভার দিয়ে গেল, আমি ঐ সুপ্ত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, কত কি ভাবনা,—কত রকমের চিন্তাই মনের মধ্যে চলতে লাগলো। তার মধ্যে প্রধান যেটি, তা হোলো,—আজ আমার এখানে থাকাটা কতটা অন্যায় হোলো। না থাকাই যে

বাঞ্ছনীয় ছিল সে সম্বন্ধে মনে আর দ্বিধা রইলো না। এখন? এক দিকে যেন বেঁধে মারা অপর দিকে মার খাওয়া।

বাবাজীর আবির্ভাব, যে দিকে মেয়েটি গেল সেই দিক থেকেই। আমি উঠে গিয়ে তাঁর কাছে বল্‌লাম,—দেখুন আমি বেশ বুঝতে পারচি আজ আমিই আপনার শান্তি ভঙ্গ করেছি,—যদি এখনও উপায় থাকে আমি চলে যেতে রাজী আছি।

বাবাজী বললেন, মুখে তার শ্লেষপূর্ণ হাসি,—যাওয়া আপনার উচিৎ ছিল আগেই কিন্তু রূপবতী যুবতীর মোহেই তা যখন পারেন নি তখন, এখন আর ও সব কথায় কাজ কি?

আঃ—কানে মোচড় দিয়ে ঠিক যেন সজোরে ঠাস করে গালে আমায় এমন চড় বসিয়ে দিলে, আমার মাথা ঘুরে গেল। একটু সামলে বললাম,—দেখুন, আপনি বাঙ্গালী বলেই আজ বলচি, অন্য, কেউ হলে বলতাম না। আমাদেরই একজন বঙ্গ সন্তানকে এই অবস্থায় এখানে দেখবো এ আশা করিনি; যতটা গভীর বিস্ময় ততটাই মর্ম্মান্তিক বেদনা যে আমি ভোগ করচি তা বোধ হয় আপনি অনুমানও করতে পারেন নি। গৈরিক পরে নারী সঙ্গ,—আবার নামে সিদ্ধজী,—

বাধা দিয়ে তিনি বললেন,—না না, সিদ্ধজী আমার নাম নয়। সাধু সন্ন্যাসী সমাজে কোন নতুন লোক এলে, তার নামটি জানা না থাকলে তাকে সিদ্ধজী, মহাত্মাজী, বাবাজী, সন্তজী ইত্যাদি নামেই ডাকা হয়। ঐ মেয়েটি কনকা, সেই হিসাবেই আমায় উদ্দেশ করে কিছু বলতে সিদ্ধজী বলেন। আমার নাম দেবানন্দ। আজ যখন বিধাতার নির্ব্বন্ধে আপনার এখানে থাকবার যোগাযোগে হয়েচে, আর আপনি আমার স্বদেশী স্বজাতি তখন আমার জীবন কাহিনী সংক্ষেপেই আপনাকে শুনাতে চাই,—শুনে বিচার করে আপনি দেখবেন আমার অবস্থায় পড়ল যে কেউ—

অসহ্য হল এবার, বললাম, আচ্ছা, থাক এখন একথা। সুমুখেই দেখি কনকা একটি লণ্ঠন নিয়ে এসে রাখলে, তার পর বললে,—এখানে আমরা ঠিক এই সময়েই খেয়ে নি। আপনারা বসুন আমি খাবার নিয়ে আসি।

আমার ভিতরে যথেষ্ট ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছিল কিন্তু খেতে ইচ্ছাই ছিল না বিশেষতঃ পাশাপাশি,—দেবানন্দের সঙ্গে। কিন্তু আহার আমায় করতেই হোলো। নীরবেই আমরা উপভোগ করলাম, গরম রুটি,—সুপক্ক ও উত্তম রূপে ঘৃতসিক্ত, শাক, আর আমসী মসলা দেওয়া তেলে ফেলা। শেষে দুধ।

যখন ভোজন পালা শেষ হ'ল তখন কনকা নিঃসঙ্কোচে এসে বসলো আমাদের

সঙ্গে,—আর ততোধিক নিঃসঙ্কোচে আমার পরিচয়, জীবন কথা জানতে চাইলে। সে স্পষ্ট ভাবেই জানতে চায়। কেন আমি বেরিয়েচি,—আর কি পেয়েছি। অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিক্ষিতা মেয়ে,—অসাধারণ তার সব কিছুই জানবার আগ্রহ। যখন আমার কথা সব তার শোনা হোলো,— তখন অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা। আমি বসে বললাম,—এইবার আপনাদের কথা শুনতে হবে,—বলুন।

আমার কথা, কনকা বললে,—খুব বেশী নয়, যে টুকু বিশেষ তার মধ্যে সেইটুকু বলচি শুনলেই বুঝতে পারবেন। আমার বাবা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও কাশীতে উকিল,—এক মাত্র মেয়ে আমি। আমার যখন নয় বৎসর বয়স আমার মা মারা যান;—তারপর বাবা আমার সন্ন্যাসী বৈরাগীর মতই হয়ে পড়েন;—একেবারেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যান নি কোথাও,—তবে কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে শাস্ত্র চর্চ্চা জপ ধ্যান এই সব করতেন। সাধু সন্ত দেখলে যত্ন করে ঘরে আনতেন; সেবা করাতেন। ভজন সাধনের উপদেশও নিতেন। বারো বৎসরে তিনি আমার বিবাহ দেন তাঁরই বন্ধু কোন উকিলের ছেলের সঙ্গে। তারপর আমার স্বামী বিসূচিকায় মারা যান বিবাহের এক বৎসর তিনটি মাস পরে। সেই থেকে বাবা আমায় তাঁর সকল কাজেরই সঙ্গের সাথী করে রাখলেন। প্রথম প্রথম তাঁর ইচ্ছা ছিল আবার আমার বিবাহ দিবেন। বাবার একদল বন্ধু ছিলেন সপক্ষে আর সনাতন পন্থী একটা বড় দল ছিল এর বিপক্ষে কিন্তু বাবার জেদ ছিল তিনি ঠিক আমার বিবাহ দেবেন। একজন ধনী প্রতিবেশী তার ছেলেকে বিলাত পাঠিয়ে ছিলেন ছেলে তার ব্যারিস্টার হয়ে এলাহবাদ হাই কোর্টের বারে প্র্যাকটিস করচেন। বিবাহও হোতো তার সঙ্গেই দুটি কারণে সেটা ভেঙ্গে গেল পাকা কথা হবার পর। প্রথম, সেই ব্যারিষ্টার সাহেব একটা মোটা টাকা চেয়ে বসলেন বাবার কাছ থেকে,—আর সেই টাকা,— তাঁর বিধবা মেয়েকে বিবাহ করছেন বোলেই চাই। আর দ্বিতীয় কারণ, খবর পাওয়া গেল সে অতি দুশ্চরিত্র লোক। ঐ খানেই একজন বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির মেয়েকে নিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়ে দিন কতক গা ঢাকা দিলেন,—তারপর না কি সে ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। তাঁর আরও গুণের কথা জানা গেল, তিনি জুয়ার ভক্ত। ইতিপূর্ব্বে জুয়াতে বাপের অনেক টাকা লোকসান করেছেন। এখনও অনেক দেনা। এই সব শুনে বাবা মত পরিবর্ত্তন করলেন। তিনি সমাজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষে আমায় নিয়ে হিমালয়ে গেলেন। মুসৌরীতে আমরা প্রায় চার বৎসর ছিলাম। সেই খানেই আমার অধ্যয়ন আরম্ভ হল। আমিও সংকল্প করলাম তত্ত্ব জ্ঞান আলোচনায় জীবন কাটাবো।

সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত এই তিনটি দর্শন শাস্ত্র আমি পাঁচটি বৎসর ধরে একান্ত অধ্যাবসায়ের সঙ্গে পড়ে ছিলাম। পড়ার দিক থেকে খাঁটি ছিলাম। শব্দ-অর্থ-বোধ আমার মোটা মুটি ভালই ছিল কিন্তু যে সাধনে সিদ্ধির পথে যাওয়া যায়,—সে দিকে যাবার যত্ন তখন ছিল না। বাবার ধারণা ছিল একটু বেশী বয়স, অন্ততঃ পঁচিশ থেকে ত্রিশ বৎসর না হলে, মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ পুষ্ট না হলে সাধন বা সিদ্ধি কখনই সম্ভব হয় না। অসময়ে তাড়াতাড়ি কাঁচা বয়সে সাধন কখনই তখনকার শুভ হয় না। তাই অধ্যায়নই ছিল আমার তপস্যা। তিন বৎসর পর আমরা আবার ফিরে এলাম।

বাবা আমাদের সহরের বাড়ী ছেড়ে গিয়ে অসির তীরে, সহর থেকে অনেকটা দূরে একটি ছোট বাগানের মধ্যেই আমায় নিয়েই থাকতেন। যখন আমার বয়স প্রায় আঠারো বৎসর,—তখন এক অদ্ভুত যোগাযোগে এই সিদ্ধজী এসে উঠলেন অতিথি হয়ে আমাদের আশ্রমে। বাবার কেমন একটা স্নেহ, মমতা হয়েছিল এর উপর এর জীবন কথা শুনে, তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন না। অবশ্য সেই সময়ে বাবা পীড়িত হয়েও পড়লেন, বাতে পঙ্গু হয়েছিলেন। এর সেবা দ্বারা তখন তাঁর যে কাজ হয়েছিল, তাই একে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত মনে করেছিলেন। তা ছাড়া আমায় পাঠ অধ্যাপনার ভার এঁর উপরেই দিয়েছিলেন। তাঁর সামনেই, পাঠ ব্যাখ্যা চলতো। এঁর ব্যাখান বাবার খুব ভালো লাগতো। উপদেশ করবার ভঙ্গী ছিল চমৎকার,—বাবা ভারি পছন্দ করতেন। বাবার শরীর উত্তর উত্তর খারাপ হয়েই চলেছিল। আমরা দুজনেই তার সেবা করতাম,—তিনি বলিতেন, এ অবস্থায় ঘর ছাড়া ভাল হয় নি তোমার। তিনি যেন বুঝলেন আমরা দুজনেই ক্রমে ক্রমে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়চি। তিনি বোলতেন,—সংসার ভোগ প্রবৃত্তি সূক্ষ্ম এটা স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়মেই এটা হয়। ভাবে যুবা সাধুদের মনের মধ্যেও থাকে। তার ফলে তাদের নেমে আসতে হয়। সংসার ভোগ করে নিয়ে তার সাধন মার্গে নামা উচিৎ। তোমরা মনে কোন পাপ রেখো না,—এ আকর্ষণ তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি চাই তোমরা বিবাহিত হয়ে গার্হস্থ জীবন যাপন কর,—আর সেই সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে মানব জন্ম সফল করো।

ক্রমে তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিলেন, একদিন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হোয়ে পড়লো আমাদের দুজনকে দুদিকে রেখে, দুজনের দুই হাত এক করে দিয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি, আমার আশীর্বাদ রইল তোমাদের উপর; তোমরা সুখী হয়ে তোমাদের গার্হস্থ আর অধ্যাত্ম জীবন সফল কোরো। সমাজের মধ্যে সব রকমের জীবনই দেখতে পাওয়া যায়। কোনটাই ফেলবার নয়, প্রকৃতি জননী সকলকেই আপনার কোলে স্থান দিয়েছেন;

যদি তোমরা সংস্কার মুক্ত হয়ে জীবনকে উন্নত করতে পার,—তাহলেই আমার সে উদ্দেশ্য সার্থক হবে তোমাদের এক করে দেওয়াতে। তোমাদের উপর ভার রইল তোমরা বিবাহিত হয়ে জীবন আরম্ভ করবে অথবা বিবাহ সংস্কার বাদ দিয়েই করবে। তবে আমার মনে হয় আমাদের প্রবৃত্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সংস্কার ত্যাগ করা উচিৎ নয়। আমার আর কিছুই বলবার নেই। বাবা আমার সেই দিনই মারা যান। তিনি এক সময়ে উপার্জ্জন করেছিলেন অনেক। মা মরে যাবার পর কাজ কর্ম্ম ছেড়ে ঘরে বসে বসেও অনেকদিন কিছু কিছু উপার্জ্জন করতেন, যে কাজ সামনে হাতে এসে পড়তো। তারপর নানা স্থানে বিশেষতঃ হিমালয়ের মধ্যে ভ্রমণে অনেক কিছু খরচও করেছেন। প্রায় বাইশ হাজার টাকা আমার নামে রেখে গিয়েছিলেন। আমাদের কোন অভাব ছিল না।

হিমালয় আমাদের দুজনেরই ভাল লেগেছিল আমরা তাই ওখানকার সব কিছু ব্যবস্থা করে হিমালয়েই থাকতাম, নানা স্থান বেড়িয়েছি। কেদার বদরী, নন্দ কোট, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্তরী প্রায় এ-দিককার সকল তীর্থই ভ্রমণ করে গত বৎসর থেকে এই খানেই আমরা আছি। আমাদের সন্তানটি এই খানেই হয়েচে।

এতটা বোলে কনকা চুপ করে রইলো। দেবানন্দ বেশ স্থির হয়েই সব কিছুই শুনছিলো,—এখন যেন একটু চঞ্চল হয়েই কনকার মুখের দিকে চাইলে। তারপর আমায় বললে ;—আমার বলবার আর কিছু রই লো কি ?

আমি বললাম, আপনার পূর্ব্ব পরিচয়, সেটা আমার আর জানবার ইচ্ছে নেই।

× × ×

ঠিক সাত বৎসর পরে, আমি তখন বরোদা যাচ্ছি, সেখানে স্টেট সারভিস পেয়েছিলাম। সঙ্গে আমার স্ত্রী আর তিনটি সন্তান। মথুরা ষ্টেশনে বেলা তিনটায় নেমেছি, রাত দশটায় বম্বে মেল ধরতে হবে। অনেকটা সময়, গিয়ে ওয়েটিং রুমে দেখি একজন মধ্যবয়সী গৌরবর্ণ ভদ্রলোক স্যুটপরা, তাঁর সঙ্গে স্ত্রী, দুটি ছেলে, একটি বছর দুই অপরটি সাত আট বছরের। ছেলে গৌরবর্ণ, সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর। ভদ্রলোকের মুখখান দেখেই কেমন বুকের ভিতর ছ্যাৎ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি সামনে গিয়েই জিজ্ঞাসা করবো, কোথায় দেখেছি আপনাকে—কিন্তু স্মৃতির আলো জ্বলে উঠলো সেইক্ষণে,—বললাম,—সিদ্ধজী নাকি ?

ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন,—তাঁর স্ত্রী কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন ;—আমার দিকে ফিরে তিনি একটু হেসে বোললেন,—কালী ঝোরা কি পাশ গুফা কি পরচয়্,—এক সাঁঝ,—হৈ কি ন হি ?—

জী হাঁ,—কনকা দেবী,—ধন্যবাদ্ আপ্‌কি ইয়াদ, নমস্কার!—

তখন দেবানন্দজি উত্থিত ভ্রু নামিয়ে বললেন,—ওঃ—ওঃ—কতটুকু সময়ের পরিচয় আপনার মনে আছে ? আশ্চর্য্য !

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোনটা আশ্চর্য্য ? এখানে দেখা হওয়াটা, না অবস্থার পরিবর্ত্তনটা ?

শিক্ষা সংস্কারের গোড়ার কথা

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সকল প্রকার সংস্কারের ভিত্তি হইল জনমত। জনমতকে গঠিত করিতে না পারিলে শুধু আইন পাস করিয়া কোনও সংস্কার প্রবর্ত্তিত করা যায় না। সমস্ত সংস্কার সম্বন্ধেই একথা খাটে। আমাদের দেশে অনেক সমাজ-সংস্কার-মূলক আইন পাস হইয়াছে, যথা সম্পত্তি আইন ইত্যাদি, কিন্তু জনমতের আন্তরিক সমর্থনের অভাবে উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে প্রথমেই চাই জনমতকে উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যদি দেশ না বুঝে, বা শিক্ষার সমাদর করিবার লোক যদি অল্পসংখ্যক হয়, তাহা হইলে আইনের দ্বারা সংস্কার সাধন করিয়া শক্তিশালী দেশ-নেতারা আনন্দ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। সুতরাং প্রথমেই জনমতকে শিক্ষাসংস্কারের উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষিত করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কারের প্রচেষ্টা হইতেছে, তাহার সহিত জনমতের কোনও বিশেষ যোগ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

তাহার কারণ আমার মনে হয় এই যে, আমাদের দেশের জনসাধারণ প্রধানতঃ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, দৈন্যের বিভীষিকায় ম্রিয়মাণ। সুতরাং আমরা আগেই জানিতে চাই যে এই সংস্কার আমাদের ব্যয়ভারাবনত পৃষ্ঠে আবার এক করভারের জঞ্জাল চাপাইবে না ত? সে আশ্বাস এখনও কোনও পক্ষ হইতেই পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য সমস্ত সংস্কারের প্রস্তাবই জনসাধারণ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। দেশের মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত সংস্কারের কথায় কেহ কর্ণপাত করে না দেখি। বর্ত্তমানে কতকগুলি অবান্তর ব্যাপার ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়াতে কতক লোকের মধ্যে কিছু কৌতুহল ও চাঞ্চল্য যে না জাগিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু সে সকল ব্যাপার শিক্ষা সম্বন্ধে উত্থাপিত হইলে প্রত্যেক দেশ হিতৈষী ব্যক্তিই শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যে মগ্ন হইবেন সন্দেহ নাই। ক্ষমতা প্রিয়তা যদি মস্তিষ্কের উষ্ণতা সম্পাদন করে, কি উহা অপেক্ষাও কোনও গূঢ় অভিসন্ধি সংস্কার বাসনার পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকে তাহা হইলে প্রকৃত শিক্ষার উন্নতিবিধান হইতে পারে না। সেই জন্য সংস্কারের অনিস্টকারিতা আশঙ্কা করিয়া অনেকে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

দেশ কি চায়? দেশ চায় যে শিক্ষা ভাল হউক, উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হউক, অন্নসমস্যা ঘুচুক, অজ্ঞানতিমির দূর হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে বেশী স্কুল চাই, ভাল শিক্ষক চাই, ভাল গ্রন্থাগার চাই, স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই, চরিত্রগঠন যাহাতে সুচারুরূপে হইতে পারে তদ্বিষয়ে মনোযোগ চাই। বলা বাহুল্য ইহার অতিরিক্ত কোনও অর্থ—'সংস্কার' কথাটি নিঙড়াইয়া বাহির করা যায় না। মাধ্যমিক, প্রাথমিক, এমন কি উচ্চতম শিক্ষায়ও জনমতের দাবী ইহাই। কিন্তু এ সকলের জন্য চাই অর্থ। অর্থ বিনা কোনও প্রতিষ্ঠানকে বড় করা যায় না, ভাল করা যায় না। শিক্ষাকে ব্যাপকতর এবং উৎকৃষ্টতর করিতে হইলে, অধিক সংখ্যায় বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক হইবে, যে সকল বিদ্যালয় আছে নির্জীবভাবে, সেগুলির মধ্যে রুধির সঞ্চালন করিয়া তাহাদের প্রাণশক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে। দেশের আর্থিক দুর্দ্দশা ও দৈন্যের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কোনও মতে কায়ক্লেশে বাঁচিয়া আছে মাত্র। সংস্কারপন্থীরা চাহেন যে এই সকল মুমূর্ষু বিদ্যালয়কে একেবারে তুলিয়া দেওয়া হউক এবং যে গুলি ভাল ভাবে চলিতেছে, শুধু সেইগুলিকে বা প্রয়োজন হইলে আরও দুই চারিটি ভাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সে গুলিকেই শুধু রাখিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ইহাই যদি শেষ সিদ্ধান্ত হয়, তবে ত দেশের শিক্ষা সমস্যার সমাধান হইবে না। প্রথমতঃ অনুসন্ধান করা আবশ্যক যে, যে বিদ্যালয়গুলি কোনও প্রকারে শিক্ষার দীপটি জ্বালিয়া রাখিয়াছে, সেগুলির আবির্ভাব কেন হইল এবং এত দিন ধরিয়া টিকিয়াই বা আছে কেন? দুই একস্থলে দলাদলি ও খামখেয়ালী প্রতিযোগিতার ফলে অনাবশ্যকভাবে কতকগুলি স্কুল স্থাপিত হইলেও তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় ও নগণ্য। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই জনসাধরণের শিক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই সকল স্থলে আর্থিক অবস্থার দৈন্য হেতু বিদ্যালয়গুলি স্বল্পতৈল প্রদীপের ন্যায় কোনও মতে আত্মরক্ষা করিতেছে। এই সকল স্থলে জনসাধারণের অপরাধ কি, আর বিদ্যা লয় গুলির অপরাধই বা কি? উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পাইলে এই সকল স্কুল উৎকৃষ্ট বিদ্যায়তনে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু কোথায় সে অর্থ? সরকার দিতে পারেন না, কারণ রাজকোষে প্রচুর অর্থ নাই। শাসক সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। অপ্রিয় কথায় অর্থের অভাবও ঘুচে না, জটিল মনোবৃত্তিও একদিনে বদলাইয়া দেওয়া যায় না। আমার বক্তব্য এই যে, শিক্ষার ন্যায় জাতীয় জীবনের ভিত্তিভূমি লইয়া খেলা করা চলে না। সংস্কার অত্যাবশ্যক, ইহা কেহ অস্বীকার করে না; ইহা যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, সে সম্বন্ধেও চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু জনসাধারণ এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই করিতে পারে যে সংস্কার করিতে হইলে যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হইতে পারে, তাহার সংস্থান আছে কি না, যে উদারনীতি এবম্বিধ সংস্কারের মূল ভিত্তি, সে উদারনীতির অনুভূতি এবং স্বীকৃতি আছে কি না। মনে করুন জাপানের সহিত যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে শত্রুর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই দণ্ডায়মান হইতে হইবে, প্রাণপণে শত্রুর আক্রমণ বিফল করিয়া দিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কখনও দ্বিমত হইতে পারে না, কিন্তু অকস্মাৎ যদি দেখা যায় যে বন্দুকগুলি পুরাতন, বারুদ ভিজা, উড়োজাহাজ বিদেশের কারখানায় তৈরী হইতেছে, তখন শত্রুর গতি প্রতিরোধ করিবার কল্পনা যেমন বাতুলতা ব্যতীত অন্য কিছুই মনে হয় না, তেমনই শিক্ষা সংস্কারের অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ না থাকিলেও, প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন হইতেছে সামর্থ্য আছে কি না।

সামর্থ্য পূর্ণমাত্রায় না থাকিলেই যে সংস্কারের চেষ্টা করিতে হইবে না, তাহা বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, প্রথমত দেশের অবস্থা, স্কুলের অবস্থা, শিক্ষার চাহিদা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এরূপ Educational Survey যে একান্ত আবশ্যক, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সময় আসিয়াছে যখন এই বিষয়ে আর ধ্যান না দিলে চলিবে না।

আমাদের দেশ আর্থিক অনটনে চিরদিনই ক্লিষ্ট। সুতরাং অর্থাগমের কিছু সুবিধা না করিতে পারিলে, বেকার সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে না, যাহারাও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িতেছে, তাহারাও বেতন দিতে পারে না। তার পরে মফঃস্বলের প্রায় গ্রামই ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মহামারীতে প্রায় উজাড় হইয়া যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেন ছেলে বাড়াও, তাহা না হইলে তোমার পরীক্ষা-যোগ্যতা (affiliation) কাড়িয়া লইব। পরিদর্শক বলিলেন, তোমাদের টাকা কম, কিছুতেই তোমার স্কুল থাকিতে দেওয়া যায় না। কিন্তু ছাত্র কোথা হইতে আসিবে? বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে পল্লী লোকজনের কলরবে মুখরিত ছিল, আজ তাহা নিস্তব্ধ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। কতক লোক মরিয়া গিয়াছে, কতক লোক ছাড়িয়া গিয়াছে। এ সকল প্রত্যক্ষ ঘটনা। আমরা সুলভ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নাগরিক জীবনের মোহ সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা করি। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ভাবিয়া দেখি না। Back to village খুব ভাল কথা। কিন্তু গ্রামকে বাসোপযোগী করিবার কথা ত কেহই বলে না। ইটালীতে দেখিয়াছি, 'দুর্দ্দান্ত' মুসোলিনীর প্রভাবে প্রত্যেক পল্লীর প্রতি লোকের নজর পড়িয়াছে। রাস্তা ঘাট, হাঁসপাতাল, স্কুল সমস্তই রাজসরকার হইতে স্থাপিত হইতেছে।

আবার পল্লীগুলি আগের মত হাসিয়া উঠিয়াছে! আমাদের দেশে সেরূপ চেষ্টা কোথায়ও দেখি নাই। Rural Reconstructionএর কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। শাসন কর্ত্তাদের এই দিকে মনোযোগ দেওয়া বেশী কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া কতকগুলি লোকের সুবিধার জন্য এমন সকল আইন প্রণীত হইয়াছে যে, যাহাদের উপকারের জন্য সেগুলি কল্পিত, তাহাদের পদেই কুঠার পড়িতেছে সর্ব্বাগ্রে। সে যাহা হউক পল্লী সংস্কার ঋণ সালিশীর দ্বারা যত হউক বা না হউক, কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। অন্ততঃ এই সকল ব্যবস্থা না করিলে কোনও সংস্কারই যে হইতে পারে না, তাহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শিক্ষা দীনাতিদীন পল্লীবাসীর দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইলে, তাহার বাঁচিয়া থাকার অধিকারকে সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতে হইবে এবং সেই দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। তাহা না করিলে, সর্ব্বৈব বৃথা।

"মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না, তখন কেহ বা বাংলার মিল্টন্, কেহ বা বাংলার বায়রন, কেহ বা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—এমন কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক বলিলে আমাদের আশ মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারো সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা;—কারণ, গ্যারিক যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মান্তর যাপন করিতেছিল।"

—রবীন্দ্রনাথ

মারণ-যজ্ঞ

প্র. না. বি.

তোমরা যাই বল না কেন—ইউরোপের মত এমন পরার্থপর দেশ আর নাই!

কেন?

কেন বুঝিবে কেমন করিয়া! নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ যাহারা করে নিজের গলা কাটিয়া পরের যাত্রার আসর জমাইবার মর্য্যাদা তাহারা বুঝিবে কি করিয়া?

গত মহাযুদ্ধের কথা মনে আছে? যখন ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছিল তখন আমরা নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া বড় বড় মানচিত্র আর লাল নীল পিন কিনিয়া কোন্ পক্ষ কত দূর অগ্রসর হইল নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। ইউরোপের নদী নালা সহর গ্রাম পাহাড় পর্ব্বত তখন বেশ মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল! আমরা, ভারতীয়েরা, চিরদিন-ই ইতিহাসের চার-আনার গ্যালারীর দর্শক; দূরে থাকিয়া দেখি, চানাচুর চিবাই, হাততালি দিই আর সংবাদপত্র পড়ি।

সেই সংবাদপত্র পড়িবার অভ্যাস ছাড়ি নাই—বরঞ্চ অন্য সব অভ্যাস ছাড়িয়াছি।

সত্য কথা বলিতে কি, আজকাল সংবাদপত্র ছাড়া আর কিছু পড়ি না। আবার সংবাদপত্রেরও সবটা নয়, কেবল বৈদেশিক সংবাদ আর পাটের বাজারের পূর্ব্বাভাষ! কবে যুদ্ধ বাধিবে আর কবে পাটের দর চড়িবে!

কেন?

আচ্ছা তবে খুলিয়া বলি! ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও পাট জন্মে? যুদ্ধ বাধিলেই পাটের দর চড়িবে—পাটের দর চড়িলেই বাঙ্গালী কৃষকের অবস্থা ভাল হইবে, তাহার অবস্থা ভাল হইলেই তোমারও ভাল!

যখন পরহিতের জন্য (কারণ আমার পাটের ক্ষেত নাই) প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ নন্দ-দা আসিয়া হাজির!

নন্দ-দা বলিলেন, ভায়া এবারে কাজ হাঁসিল! আমি তাঁহাকে বসিতে দিয়া বলিলাম—এক কাপ চা আনাই!

নন্দ-দা বলিলেন—যা' করবে চট্ পট্! চা আসিল, নন্দ-দা চা পান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে পাঠক তোমাকে তাঁহার পরিচয়-টা দিই।

নন্দ-দার অবস্থা এক সময়ে খারাপ ছিল, তখন তিনি আমাদের দশজনের মতই সাধারণ লোক ছিলেন। তারপরে অবস্থা যখন ভাল হইল তখন তিনি অসাধারণ হইয়া উঠিলেন—অর্থাৎ রাতা-রাতি চাঁদনী হইতে একটা স্যুট ও প্রাচীন শাস্ত্র হইতে একটা ফিলজফি সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। এখন তিনি ঘোর বিশ্বপ্রেমিক!

বিশ্বপ্রেম কি?

যে-ভাব মনে উদিত হইলে ঘরের পাশের প্রতিবেসীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া ব্রেজিল ও বেলজিয়ামের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার ইচ্ছা হয়, সংক্ষেপে তাহাই বিশ্বপ্রেম।

এ হেন বিশ্বপ্রেমিক নন্দ-দা' কিছুদিন হইতে জগতের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন! তাঁহার মতলবটা এই রকম—জগতের বর্ত্তমান দুঃখ দুর্দ্দশার মূলে axis powerএর অত্যাচার। কোনরূপে এই axis বা অক্ষ ভাঙ্গিতে পারিলে জগতে শান্তি আবার ফিরিয়া আসিবে। আর এই axis-এ আঘাত করিতে হইলে একেবারে মাঝখানে আঘাত করা উচিত অর্থাৎ হিটলারকে সায়েস্তা করিতে পারিলেই সব ঠাণ্ডা!

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গত দুই বৎসর হইতে তিনি নানা রকম উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

প্রথমে তিনি জার্ম্মাণ-যাত্রী একটি বাঙ্গালী ছাত্রের সঙ্গে কিছু কচুরী পানার শিকড় দিয়াছিলেন। সেই শিকড় সেখানকার জলে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ক্রমে দেশটা কচুরী পানায় ছাইয়া ফেলিবে এবং কালক্রমে জার্ম্মাণী বাঙ্গলাদেশ হইয়া উঠিবে! বাস্।

কিন্তু জার্ম্মাণীতে প্রবেশের সময়ে শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী চালাকি ধরিয়া ফেলিল; কচুরী পানার শিকড় জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিতে পারিল না এবং পরের দিন জার্ম্মাণীতে কচুরী অর্ডিনান্স প্রচারিত হইল!

কিন্তু নন্দ-দা দমিবার পাত্র নহেন। কিছুদিন পরে তিনি কতকগুলি স্বপ্নাদ্য মাদুলী জার্ম্মাণীতে পাঠাইলেন—উদ্দেশ্য, এই মাদুলী ধারণ করিতে করিতে সে দেশের লোক ধর্ম্মভীরু ও অহিংস হইয়া উঠিবে। কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। সে দেশের মেম সাহেবরা মাদুলিগুলাকে 'ইণ্ডিয়ান অর্ণামেণ্টস্' মনে করিয়া তুষার-ধবল নিটোল বাহুতে পরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনরূপ ফল ফলিল না। নন্দ-দা বলিলেন, ম্লেচ্ছের স্পর্শে ওষুধের গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন আগে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—ওহে এবার এক মতলব ঠাওরানো গিয়াছে—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি ?

—শোন তবে! আমাদের নোট-সম্রাট মহান্তিকে জান তো! তাঁকে পাঠাবো জার্ম্মাণীতে! সে দেশের স্কুল কলেজের বইয়ের নোট লিখে, অর্থাৎ বাঘ মানে শার্দ্দুল লিখে ছেলেগুলোর মাথা খেয়ে দেবেন। দেখ্‌বে এক generation-এর মধ্যে জার্ম্মাণী বাঙ্গলাদেশ হয়ে পড়বে! কিন্তু মুস্কিল কি জানো, মহান্তি জার্ম্মাণ জানে না, তাকে জার্ম্মাণ শিখে নিতে বলেছি!

আজ নন্দ-দার আগমনে বুঝিলাম যে, সেই বিষয়ে কিছু পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে নন্দ-দার চা-পান শেষ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম– কি দাদা, মহান্তি জার্ম্মাণ শিখলো ?

নন্দ-দা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন—ধ্যেৎ, ওসব জার্ম্মাণ টার্ম্মাণের কাজ নয়। এবার আসল উপায়ের সন্ধান মিলেছে।

আমি জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া রহিলাম। তিনি গলা খাটো করিয়া বলিলেন – ঘরে কেউ নেই তো ?

– দেখতেই পাচ্ছেন !

—বাইরে ?

—সব সিনেমার অগ্রিম টিকিট কিন্‌তে গিয়েছে।

—তবু একবার দেখে এসো !

বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিলাম।

তিনি বলিলেন – দরজায় এবার খিল এঁটে দাও।

দরজায় খিল দিলাম।

তিনি বলিলেন—কাছে এসো !

কাছে গেলাম।

গলা খাটো করিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলেন– একজন মহাতান্ত্রিকের দেখা পেয়েছি —একেবারে সাক্ষাৎ অবধূত।

আমি মূঢ়ের মত বলিলাম—ব্যাপার কি ?

— ব্যাপার আবার কি ? আজ শনিবার, অমাবস্যা ! রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে নৈঋতে যখন যোগিনী আস্‌বে - বাস্ ! বাছাধনের আর মস্কোতে যেতে হ'বে না !

তারপরে একটু থামিয়া নিঃসংশপ্রমাণের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন—নৈঋত কোণে মস্কো কিনা, কি বল ?

কি আর বলিব !

বলিলাম—আপনিই বলুন !

তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—উহু এখন নয়। স্বামীজীর নিষেধ! এই নাও ঠিকানা, রাত্রি দশটার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে—বিলম্ব করো না।

দেখিলাম দমদমের এক বাগানবাড়ীর ঠিকানা !

নন্দ দা এসব কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে দমদমের বাগানবাড়ীতে পৌঁছিলাম ; দ্বারদেশে নন্দ-দা অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু নন্দ-দার একি বিচিত্র বেশ ! পরণে লাল চেলি, গায়ে লাল চাদর, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, হাতে ত্রিশূল, পায়ে খড়ম, মুখে ব্যোম্-ব্যোম্ রব, চোখ দু'টাও যেন লাল !

আমি বলিলাম—নন্দ-দা একি !

তিনি বলিলেন—চুপ ! সঙ্গে এসো।

সঙ্গে চলিলাম !

বৃহৎ একটি অট্টালিকা, যেমন নির্জ্জন তেমনি নিস্তব্ধ, তেমনি ভগ্নপ্রায় ! আমি নন্দ-দাকে অনুসরণ করিয়া দোতলায় উঠিতেছি। একটি কেরোসিনের ডিবে ক্ষীণ আলোদানের উপলক্ষ্যে পুঞ্জপুঞ্জ ধোঁয়ায় আমাবস্যা সৃষ্টি করিতেছে। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, আমি ভয় পাইলাম। নন্দ-দা কি শেষে বিপ্লবী হইল নাকি ? না ভৌতিক কিছু—শেষের কথাটা বোধ হয় জোরেই বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—

তিনি বলিলেন—অবধৌতিক।

তবে সেই যে সকালে বলিয়াছিলেন একজন অবধূত মিলিয়াছে, এ বাড়ী বোধ হয় তাহারই নিকেতন !

একটি বৃহৎ হলঘরে প্রবেশ করিলাম ! নন্দ-দার মনে তবে এই ছিল ! মনে হইল কপালকুণ্ডলার কাপালিকের আশ্রমটিকে আস্ত উঠাইয়া আনা হইয়াছে। মেঝেতে খান পাঁচ-ছয় কুশাসন জোড়া দিয়া এক বিরাট অবধূত বসিয়া আছেন ; তাঁহার ধুতি, চাদর লাল ; রক্তচন্দনে কপাল লাল ; কিসের প্রভাবে চোখ দুটি লাল, পাশে একখানা ত্রিশূল পড়িয়া, হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের রাশি। সম্মুখে যজ্ঞের আয়োজন ; বালি, পাটকাঠি, ঘৃত, বিল্বপত্র, খড়গ, কোশাকুশি, ধূপদানী, ছিন্ন-ছাগমুণ্ড এবং অদূরে কয়েকটি সন্দেহজনক বোতল ! তবে কি আমিই নবকুমার ! নন্দ-দার মনে শেষে এই ছিল !

নন্দ-দা কানে কানে বলিলেন, বাবাজীকে প্রণাম কর।

প্রণাম করিলাম!

বাবাজী বলিলেন—বৈঠো বাচা!

তবু ভাল—তিনি যে 'ভৈরবী প্রেরিতহসি' বলেন নাই! বাবাজীর গলাতে একখানা তক্তির মত কবচও লক্ষ্য করিলাম!

তখনও সন্দেহ নিরসন হয় নাই নবকুমারের কার্য্য যে আমাকে দিয়া হইবে না তখনো নিশ্চিত হই নাই——এমন সময় দেখিলাম অদূরে অস্পষ্ট আলোকে একখানা ছবি একটি কাষ্ঠফলকে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। সে ছবি হিটলারের! সদ্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে কাঁচি চালাইয়া কাটা! বুঝিলাম নন্দ-দার উদ্দেশ্য মহৎ!

নন্দ-দা বলিলেন, বাবাজী, লগ্ন আসন্ন!

বাবাজী বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা! থোড়া কারণ পান কর্ না!

নন্দ-দা একটি বোতল অগ্রসর করিয়া দিলেন; বাবাজী অকারণে অনেকটা পরিমাণে কারণ পান করিয়া ফেলিলেন। তারপরে খানিকটা প্রসাদ নন্দ-দাকে দিলেন, তিনি ভক্তিভরে পান করিলেন; আমার হাতেও খানিকটা দিলেন, আমি তাঁহাদের অগোচরে ফেলিয়া দিলাম!

এইবার বাবাজী হোম করিতে বসিলেন!

তান্ত্রিকমতে পূজা! শনিবার আমাবস্যার নিশীথ রাত্রি!

বালু সাজাইয়া, চারিদিকে পাটকাঠি দিয়া, মাঝখানে প্রচুর পরিমাণে যজ্ঞডুম্বুরের সমিধ্ রক্ষা করিয়া বাবাজী যথাশাস্ত্র অগ্নি জ্বালিলেন; ঘৃতনিষিক্ত অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; তীব্র আলোকে ভয় পাইয়া ঘরের কড়িকাঠে নিবদ্ধ কয়েকটি চামচিকা ঘরময় ফড়ফড় করিয়া উড়িতে লাগিল! বাবাজী একখানি তালপাতার চণ্ডীজাতীয় পুঁথি হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমাগ্নিতে ঘৃতাসিক্ত বিল্বপত্র আহুতি দিতে লাগিলেন! ঘৃতের গন্ধে, অগ্নির তাপে, স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি মন্ত্রের শব্দে মুহূর্ত্ত মধ্যে বৈদিক কালে চলিয়া গেলাম। বাবাজী অগ্নিতে বিল্বপত্র দেন আর 'হর্য্যক্ষ'-দৃষ্টিতে (অর্থাৎ কট্‌মট্ করিয়া) হের হিটলারের দিকে তাকাইতে থাকেন! বেচারা হিটলার!

নন্দ-দা আমার কানের কাছে বসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতে থাকেন—বুঝলে না ভায়া, বাবাজীর প্রত্যেক কটাক্ষে পাষণ্ডটার বুকের রক্তে টান্ পড়ছে! এতক্ষণে খোঁজ নিয়ে দেখ ওর 'ব্লাড প্রেসার' low হয়ে গেছে!

মূঢ় আমি বললাম—সে যে অনেক দূরে আছে।

নন্দ-দা একটি পৌরাণিক হাসি হাসিয়া বলিলেন, থাক্‌লোই বা! এযে তান্ত্রিক মন্ত্র!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য? হের হিটলারের নিধন! এই যজ্ঞের নাম মারণ যজ্ঞ। দেখবে যখন আগুনে পূর্ণাহুতি পড়বে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বার্লিনে বাছাধন চিৎপটাং! আর মস্কোতে প্রবেশ করতে হ'বে না। তার বদলে কাগজে দেখবে অকস্মাৎ হের হিটলার অ্যাপোপ্লেসি রোগে মৃত্যু মুখে পতিত।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দ-দা খানিকটা থামিলেন, তারপরে যেন নিজের মনেই বলিলেন—অনেক চেষ্টায় বাবাজীর দেখা পেয়েছি।...বুঝলে ভায়া এই এক 'ষ্ট্রোকে' রোম-বার্লিন-টোকিও-এক্সিস ভঙ্গ হ'য়ে, বিশ্বে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

নন্দ-দা পৃথিবী শব্দের পরিবর্ত্তে বিশ্ব শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ওদিকে যথাশাস্ত্র অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িতেছে, স্বাহা, স্বধা, ওঁ হ্রীং ক্রীং ধ্বনিত হইতেছে। আর চামচিকা ফড়ফড় করিয়া উড়িতেছে।

নন্দ-দা মাঝে মাঝে সন্দেহজনক বোতল অগ্রসর করিয়া দিতেছেন বাবাজী এই সমস্তের আদি কারণস্বরূপ কারণ সলিল পান করিতেছেন।

বোধ হয় একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন—হঠাৎ একটি হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, বাবাজী বলিতেছেন—বাছা পূর্ণাহুতি দেনাকা নগ্ন আ-গিয়া।

বাবাজীর হিন্দী শুনিয়া বুঝিলাম রাষ্ট্রভাষা এখনো আয়ত্ত হয় নাই। তবে কিনা অকৃত্রিম সন্ন্যাসীরা প্রায়শঃই হিন্দুস্থানী, সেই জন্য তিনি হিন্দী বলিতে চেষ্টা করেন।

নন্দ-দা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। একটি কুশিতে করিয়া ঘৃত, মন্ত্রপূত বিল্বপত্র লইয়া বাবাজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; নন্দ-দা তাড়াতাড়ি হিটলারের ছবিখানা আনিয়া বাবাজীর হাতে দিলেন—এই বারে পূর্ণাহুতিসমেত ছবিখানা অগ্নিতে পড়িবে আর সঙ্গে সঙ্গে ছ'হাজার মাইল দূরে মস্কোর পথে পাষণ্ডটা হঠাৎ অ্যাপোপ্লেসিতে...আঃ কি শাস্ত্রই না সনাতন ঋষিরা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন!

কিন্তু এমন সময়ে বাবাজী যে প্রশ্ন করিলেন সে জন্য আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না ইতিহাসেও তাহার উত্তর নাই।

বাবাজী যাহা বলিলেন বাঙ্গলায় তার অনুবাদ দিতেছি।

বাবাজী বাচ্চা, হিটলারের গোত্র কি?

সর্ব্বনাশ! নন্দ-দা আমার দিকে, আমি তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন—তোমার তো ইতিহাসে অনার্স ছিল, কোথাও কিছু পাওনি!

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, না দাদা!

তিনি বলিলেন—বেটারা সব ফাঁকি দেয়!

ভাবিলাম বলি—

গোত্র তার নাহি জানি, তাত, তবে, সে যে দ্বিজোত্তম, আর্য্য কুল জাত!

বাবাজী বলিলেন—গোত্র না বলিতে পারিলে ফল ফলিবে না।

শেষে কি তীরে আসিয়া তরী ডুবিবে! এতক্ষণের যজ্ঞের ফলে নুরেমবার্গে বোধ হয় 'ফিট' উঠিয়াছে। শেষে কি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে!

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন—হিটলার কোন্ বংশসম্ভূত?

এবার আর আমাকে ঠকাইতে পারিলেন না—আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—আর্য্য! আর্য্য!

বাবাজী যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু নন্দ-দা ক্ষেপিয়া গেল নাকি? তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হয়েছে, হয়েছে!

—কি হ'ল নন্দ-দা?

—হবে আর কি? ভাগ্যিস সুনীতি চাটুজ্জের কাছে ভাষাতত্ত্ব পড়েছিলাম! হিটলা-রের পূরো নাম পেয়েছি।

—ব্যাপার কি?

—শ্রীহিট্‌লার শর্ম্মণঃ।

আমি বলিলাম, শর্ম্মণ কি করে পেলেন?

নন্দ-দা রুখিয়া উঠিলেন, কেন পাব না? শর্ম্মণ থেকেই জর্ম্মণ। বাবা গ্রীম্‌স্ ল'র কাছে চালাকি নয়!

নন্দ-দা তখন গ্রীম্‌স্ ল'-র গৌরবে উপস্থিত কার্য্য বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তখন কেশরী হইতে কাইজার, দানব হইতে ড্যানিউব, বল্‌গা হইতে ভল্‌গা সাধিতেছেন।

বাকি সমস্যার সমাধান বাবাজী স্বয়ং করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন গোত্র জানা না থাকিলে 'যথা নাম গোত্র' বলিলেও কাজ চলিবে! তবে আর কি চাই!

বাবাজী পূর্ণাহুতি ও ছবিখানা হাতে করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; সবটা বুঝিতে পারি নাই; খানিকটা বেশ বুঝিতে পারিলাম "রোম-বুরুণালয়-তক্র-অক্ষভঙ্গায়—জগ-

দ্বিতায়- শনিবাসরে, অমাবস্যায়াং তিথৌ…আর্য্যবংশসম্ভূতস্য যথানামগোত্রস্য শ্রীঅধলোপ হিত্‌লার শর্ম্মণঃ প্রাণনাশায় ইদম্ পূর্ণাহুতিং স্বাহা!”

পূর্ণাহুতি যজ্ঞাগ্নিতে পড়িল! বাস্, নুরেমবার্গে কাজ হইয়া গিয়াছে! বিশ্বে (পৃথিবীতে নয়) আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে!

কিন্তু পাশের ঘরে ওকি অশান্তি! ও কাহাদের ভারি জুতার তালে তালে মচ্‌মচ্ আওয়াজ!

নন্দ-দার দিকে তাকাইলাম!

নন্দ-দা বলিলেন—খবর পেয়েছে।

—কাহারা?

—নাৎসী চর।

আমি বলিলাম কি আপদ্। এ যে ইংরেজের রাজত্ব!

নন্দ-দা বলিলেন—হোলে কি হয়? নাৎসীরা আমাদের ধরতে আস্‌ছে! পালাও!

উপদেশ ও উদাহরণের মধ্যে ছেদ রহিল না—নন্দ-দা সোজা দরজার দিকে ছুটিলেন! কিন্তু তক্ষণি দরজার গোড়া হইতে তীব্র টর্চ্চলাইটের ছটা ঘরের মধ্যে পড়িল!

এখন বুঝি জেলে যাইতে হয়!

দরজার কাছে জন চার পুলিশ ও জন চার উপরিতন কর্ম্মচারী!

তাহারা নন্দ-দাকে পাকড়াইয়াছে। নন্দ-দা বিড়ালের কবলে মুষিকের মত ছট্‌ফট্ করিতেছেন।

ইতিমধ্যে বাবাজী কার্য্য হাঁসিল করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। সন্দেহজনক বোতলের একটায় হাত পড়ে নাই— তিনি সেটাকে মুখের সঙ্গে লাগাইয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া আছেন—হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন রক্তাম্বর রুদ্রাক্ষভুষিত মহাদেবের নন্দী প্রাণপণে শিঙা ফুঁকিয়া প্রমথ-পালকে ডাকিতেছে!

একজন পুলিশ আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমি বলিলাম—We are performing religious duty! no interference! দেখিলাম তাহারা সকলেই বাঙ্গালী, তাই বাঙ্গলায় সুরু করিলাম—কুইন্স প্রোক্লামেশন পড়েছি! ধর্ম্মে হাত দেবার অধিকার পুলিশের নেই!

আমার কথায় নন্দ-দারও সাহস ফিরিয়া আসিল।

তিনি বলিলেন, ঠিক কথা ! আমিও পড়েছি 'সরল ভারতবর্ষের ইতিহাসে'—আমিও পড়েছি। পাতার referenceটা বলে দাও না হে !

আমি পত্র সংখ্যার কথা ভাবিতেছি—এমন সময়ে একজন কর্ম্মচারী বাবাজীর মুখের উপরে আলোকচ্ছটা ফেলিলেন—তিনি তখনও অনন্যমনা হইয়া শিঙা ফুঁকিতেছিলেন।

সেই কর্ম্মচারী পকেট হইতে একখানা ছবি মিলাইয়া লইয়া সম্মতি জানাইল। এমন সময়ে বাবাজীর গলার সেই কবচখানা চোখে পড়াতে তাহারা সেখানার উপরে আলো ফেলিয়া দেখিল তাহাতে বড় বড় করিয়া ইংরাজীতে লেখা আছে—27 M. H. ! ইহা দেখিয়া সেই কর্ম্মচারী বলিল, That's the man !

বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল—ফেরারী নাকি ? শেষ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম, ফেরারীই বটে—তবে পাগলা-গারদ হইতে !

বাবাজী সেখানকার আসামী—কিছুদিন আগে সরিয়া পড়িয়াছিলেন—খোঁজ চলিতেছিল—এতদিনে সন্ধান মিলিয়াছে।

বাবাজীকে টানিয়া লইয়া চলিল। তিনি সেই যে বোতলমুখী হইয়া রহিলেন বোতল আর নামাইলেন না। বুঝিলাম, এতক্ষণে স্বভাব ফিরিয়া পাইয়াছেন।

সে রাত্রি নন্দ-দা ও আমাকে হাজতবাস করিতে হইল। কুইন্স প্রোক্লামেশন বাঁচাইতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করায় বলিল—তোমরা যে পাগল নও তাহা প্রমাণ হয় নাই। তোমাদের মেণ্টাল অবজারভেশন ওয়ার্ডে রাখিতে হইবে।

যাহা হোক, বহু কষ্টে উদ্ধার পাইলাম। শুধু যে বাবাজী যথাস্থানে গিয়াছেন তাহা নয়, আমরাও প্রত্যেকে যথাস্থান পাইয়াছি ! আমি কাগজের সাব-এডিটর, নন্দ-দা মফঃস্বলের কোন কলেজে মাস্টারী করেন।

> "আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে, ইংরাজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এই জন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁসিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

দুই দিক

বীণা দাস

এক সিন্ধির দোকানে কাপড় কিনতে গিয়েছি।

পাশে একটা নীলরংয়ের পর্দ্দা। পর্দ্দার আড়াল থেকে একটা স্বর শোনা যাচ্ছে, স্পষ্ট, গভীর চাপা। কথাগুলো শুনিনি, শুধু গলার স্বরটা আকৃষ্ট করল,—স্বরের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।

কৌতূহলী হয়ে একটু সরে গিয়ে দেখলাম, সেখানে দাঁড়িয়ে একটী যুবক। যুবকটী সুপুরুষ, এত সুন্দর যে বাঙ্গালী বলে বিশ্বাস হয় না। যদি না জানতাম, ওকে মনে করে নিতাম পার্শী অথবা পাঞ্জাবী, কিম্বা আর কিছু। কিন্তু কথাগুলো ওর নির্ম্মল বাংলা, সন্দেহের কোনও অবকাশ তাই থাকে না।

"একবারটী আসতে পার না? একবার শুধু?···কিন্তু আমি তো বলেছি তোমায়, কথা তো দিয়েছি।—আমি জানি শুধু বড়লোক বলে তুমি রাজী হলে।—আমি তো বলেছি একবার এস না, কয়েক মিনিট শুধু—তা হোক, দেখা একবার হওয়া চাইই। বুঝতে পারছ না তুমি?"

দোকানীর কর্কশ সুর কানে এল: "দেখুন, এই রংয়ের আর নেই। যদি বলেন তো—।"

"আচ্ছা আচ্ছা এতেই হ'বে, দেখি আচ্ছা—।"

"আমি তো বলেছি তোমায়, কতবার তো বলেছি ছেড়ে দেব মদ—বিশ্বাস—"

"তাহ'লে ৪৲ করেই গজ তো?"

"এই দেখ্ না—কতটা নেব—কি করিস সব সময়।" সঙ্গীর বকুনী খেয়ে মনটা এদিকে ফিরিয়ে নিতে হ'ল, চোখটাও। খানিকক্ষণ ধরে চল্ল বাছাবাছি দর কষাকষি। Pack করে দিচ্ছে জিনিষগুলো দোকানদার এমন সময় দেখি, পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবেনি, বাঙ্গালীর উপস্থিতি রয়েছে সেখানে; সিন্ধির দোকান, তাই নিশ্চিন্ত ছিল। তবু বেশী বিচলিত হ'বার মতন মনের অবস্থাও নয় ওর। এক মুহূর্ত্ত শুধু, তার পরই মাথাটা নীচু করে চলে গেল।

"দস্তুর মত romantic ব্যাপার—নারে?"

"দস্তুর মত, – কিন্তু তোর কাণ্ডটা কি বলতো ? কাপড় কিনতে এসে ওরকম absorved হয়ে গেলি।"

"তাও তো তোর জন্য শেষটা শোনা গেল না – you snapped the string—এমন রাগ হ'চ্ছে আমার।"—

সেবার মুসুরীতে Doon View Hotelএ উঠেছিলাম। চারিদিকে বড়লোকের মেলা। Savoyএ স্থান কুলান হয়নি, তাই এখানেই আশ্রয় নিতে হয়েছে অনেকের। Mr. Roy সপরিবারে রয়েছেন। Mr. Roy—যাঁর বাবা U. P.-র বিখ্যাত ব্যারিস্টার। ছেলে কিছু করেন না। তাতে কি, তবুও এখনও তাঁর যা টাকা —ওরে বাস্‌রে।—Mr Pande, Mrs. Pande ওরাও নাকি লাখোপতি, বেচারীদের একটী মাত্র ছেলে মারা গেছে, তাই বড় দুঃখ।

তাছাড়া রয়েছে একদল ছাত্র ডেরাডুন থেকে হাঁটা পথে এসেছে আর রয়েছেন একটী নবদম্পতী মধুচন্দ্র যাপনের জন্য এসেছেন। এঁদের দলের আমরা নই, খাপছাড়া। এরাও জানে আমরাও জানি। তবু এত কাছাকাছি, ঘরের পাশেই প্রতিবেসী, মিলে মিশে থাকতে হয় বৈকী। তাছাড়া দূর থেকে এদের যত ভয় পাই, কাছের থেকে দেখি তত ভয়ঙ্কর নয়। অত সাজগোজ, রুজ, লিপস্টিক, হাইহিল, জর্জ্জেট, ডান্স, ককটেল পার্টি তবু সে সব ভেদ করেও মানুষের আস্বাদ খুঁজে পাই ওদের মধ্যে। Mrs. Royকে আমি বৌদি ডাকি,—যতইচ্ছা পান খাবার নেমন্তন্ন আমার ওঁর কাছে। Mrs. Pande তাঁর ছেলের সবগুলি ছবি দেখিয়েছেন আমায়, সে সময় ওঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে— 'এনামেল করা' গালের উপর দিয়ে। আর নবদম্পতীর রাণীকে আমি নাম ধরে ডাকি, সে আমার বন্ধু। রাণী মেয়েটী সুন্দরী, মুখরা, আনন্দের প্রতিমা ওর কথায়, গানে, হাসিতে সারা হোটেল তরঙ্গিত। আমরা সবাই ভালবাসি ওকে। ওর স্বামী তো ওকে ছেড়ে থাকেন না এক মুহূর্ত্ত। সকলে বলে 'Perfect Pair' —

সেদিন লাল ডিব্বার পথে রাণী ইচ্ছা করেই পিছিয়ে ছিল আমার সঙ্গে, কি যেন বলতে চাইছিল; শেষে হঠাৎ একবার একটু জোর করেই বলে উঠল, "আচ্ছা, Life এ মানুষ কি চায় বলো তো?"

"আনন্দ"—

"আনন্দটা কি?"

"তুমিও এই প্রশ্ন কর?"

"করিই তো—আচ্ছা, আমাকে happy মনে হয় না?"

"হয়তো —নও তুমি?"

"হ্যাঁ happy বইকি। অভাব তো কিছু নেই আমার! মানুষ যা চায় সবই আছে আমার। তা ছাড়া বিয়ের ব্যাপারে নাকি আমি খুবই বুদ্ধি দেখিয়েছি– সকলকেই হারিয়ে দিয়েছি—বন্ধুরা বলে!"

"তবে?"

"না থাক্।"

"কি থাক?"

"কিছু না,—এমনি—এই, আমরা পিছিয়ে পড়েছি ভারী, চলো এগিয়ে যাই। ওরা নইলে—একেই তো উনি তোমায় যা হিংসে করেন।"—হেসে উঠল রাণী —ওর সেই চিরন্তন হাসি।

"কিন্তু তুমি যে বল্লে না?"

"কি হ'বে ভাই বলে? আমার দুঃখটা আমারি একমাত্র precious জিনিষ। সেটার অংশ তোমায় দেবনা, সেটা আমার একার। আনন্দ আমার যা আছে সে বড় সস্তা মাল, সে তোমরা সবাই মিলে নাও আমার থেকে যত খুসী যত ইচ্ছা—" হঠাৎ ওর গলা ভারী হয়ে উঠল, মনে হ'ল চোখটাও ওর ভিজে।

ফিরে গিয়ে সঙ্গীকে বল্লাম "সেই ছেলেটার উল্টো দিক হয়তো এই মেয়েটী। গল্পটা তাহ'লে সম্পূর্ণ হয়। Broken archএর উল্টো দিক খুঁজে পেয়েছি মনে হ'চ্ছে।"

সঙ্গী বল্লে, "প্রমাণ?"

"প্রমাণ কিছুই নেই।"

"গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে,—কিন্তু সে তো বাহিরেই ঝরে পড়ে যায়; সেই তার বাহিরের অনিবার্য্য ক্ষতিকে গাছ তার মজ্জার ভিতরে তো পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাহিরেই থাকে, অন্তরের পুষ্টি অন্তরেই অব্যাহত ভাবে চলে।" —রবীন্দ্রনাথ

যা হ'য়ে থাকে

সুধাংশু রায় চৌধুরী

লালগোলাঘাট প্যাসেঞ্জার খানা যা লেট ক'রে কেষ্টনগর জংশনে পৌঁছাল, আর একটু হ'লেই নবদ্বীপগামী শান্তিপুর লোকালখানি নিশ্চয় ছেড়ে যেতো, তাড়াতাড়ি ট্রেন বদল ক'রে আরামে নিশ্বাস ছেড়ে বসলাম, পাশের বেঞ্চির এক অচেনা ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—আপনার খুব বরাত ভাল মশাই, যদি এই ট্রেনখানি ফেল করতেন তাহলে যার নাম চারটি ঘণ্টা স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হত।

হেসে বললাম—যা বলেছেন, রানাঘাট স্টেশনেই আধ ঘণ্টা লেট, তখনি এধার-কার ট্রেন পাবার আশা একরকম ত্যাগ করে ছিলাম···

ভদ্রলোক মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—'রাখে হরি মারে কে?' ভাগ্য মানেন তো? সেই ভাগ্যের জোরেই আপনি ট্রেন পেলেন মশাই, কত লোক এই ভাগ্যের জোরেই রাতারাতি ধনী হয় আবার ফকির হয়েও পথে বসে, এ কথা বিশ্বাস করেন তো?

ঘাড় নেড়ে বললাম—নিশ্চয়।

ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন—মশায়ের কতদূর যাওয়া হবে?

বললাম, নবদ্বীপ।

ভদ্রলোকটি চটে উঠে বললেন—বেড়াবার আর জায়গা পেলেন না, শেষে এই নোংরা জঘন্য নবদ্বীপে বেড়াতে চলেছেন! বয়েস হ'লে বুঝতাম তীর্থে যাচ্ছেন···।

ভদ্রলোকের ব্যবহারে বিরক্ত হ'লাম, কোন কথায় উত্তর না দিয়ে সিগারেট ওয়া-লাকে ডেকে এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি দেশালাই কিনে নিয়ে পকেটে ঢোকালাম।

টং টং করে ঘণ্টা বেজে উঠল, ট্রেনখানি সাপের মতন চলার পথে চলতে সুরু করল, সেই সময় একজন ছোকরা এসে আমাদের কামরায় উঠে পড়ল।

ভদ্রলোকটি ছোকরাকে বললেন—অমন করে লাফিয়ে উঠতে নেই বাবা। ধর, যদি পা ফস্কে ট্রেনের তলায় চলে যেতে, কি হত বল দিকিনি?

ছোকরা আমার দিকে তাকিয়ে বিনীত ভাবে বললে—একটু সরে বসুন না।

সরে বসে জায়গা করে দিলাম, ছোকরা পাশে বসে ভদ্রলোকটিকে বলল, কেউ সখ

করে দৌড়ে ট্রেন ধরে না বুঝলেন, আমার মত অবস্থায় পড়লে আপনিও ঠিক এই রকম ভাবেই দৌড়ে ধরতেন।

ভদ্রলোকটি ছোকরার কথার উত্তর না দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিলেন।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি নবদ্বীপ যাবে ভাই?

ছোকরা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার বাড়ী কোথায়?

একটু হেসে ছোকরা উত্তর দিল, নবদ্বীপেই।

বললাম, নবদ্বীপে নেমে যুগোমাতলা কোন দিকে দিয়ে যাবো বলতে পার ভাই?

ছোকরা বলল—যুগোমাতলা পোড়ামাতলার পাশেই। আমাদের দোকান পোড়া মাতলায়। আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবোখন।

ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ জানলা হতে মুখ সরিয়ে এনে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—যুগোমাতলায় কার বাড়ীতে যাবেন মশাই?

বললাম, দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীতে।

ভদ্রলোকটি বললেন, দীনবন্ধু আপনার কে হয়?

বললাম, কেউ হয় না।

ভদ্রলোকটি চোখ দুটিকে বড় করে বললেন—তবে তার বাড়ীতে কিসের প্রয়োজন?

মনে মনে বিরক্ত হলেও চেপে গিয়ে বললাম—দীনবন্ধুবাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে।

ভদ্রলোকটি হাসতে হাসতে বললেন, ও! আপনি বুঝি পাত্রপক্ষ?

গম্ভীর হয়ে বললাম, আপনি যা ভেবেছেন ঠিক তাই।

ভদ্রলোকটি বললেন—আপনি পাত্রের কে হন?

বললাম—প্রতিবাসী, বন্ধু।

ভদ্রলোকটি এইবার ছোকরার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি বাবা আমার জায়গায় একটু এসে বসো, ওঁর সাথে আমার গোটাকতক গোপোনীয় কথা আছে।

ছোকরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে গেলো ভদ্রলোকটির জায়গায়। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, ভদ্রলোক আমার কাছে এসে আমার পাশেই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললেন—যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

বললাম— বলুন না, ইতস্তত করছেন কেন?

ভদ্রলোকটি ট্রেনের কামরায় চতুর্দ্দিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—কি জানেন মশাই, আমি পরের মন্দ মোটেই দেখতে পারি না, একজন মন্দ হতে চলেছে এই কথা নিজের কানে শুনে কি করে চুপ-চাপ থাকি বলুন।

আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম—কি বলছেন আপনি ?

ভদ্রলোকটি পুনরায় কামরার চারিধার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—আপনার অবশ্য কিছু মন্দ দেখছি না, দেখছি আপনার বন্ধুর, প্রতিবাসীর।

চটে গিয়ে বললাম—কি বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন।

ভদ্রলোকটি হেসে বললেন—একটতে আপনি চটে উঠছেন দেখছি, অবশ্য যৌবন কালে আমিও আপনার মত একটুতেই চটে উঠতাম, তখন রক্ত ছিল গরম, এখন হয়েছে নিস্তেজ, কাজেই চটতেও পারি না। চটবার ক্ষমতাও নেই।

বাধা দিয়ে বললাম—আচ্ছা লোক তো আপনি ? যা বলতে চান বলুন, না হলে দয়া করে চুপ করুন।

ভদ্রলোকটি পকেট থেকে নস্যির এক বৃহৎ কৌটা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, চলবে ?

বললাম—না। মাফ করুন।

ভদ্রলোকটি দুই টিপ নস্যি নাকের গহ্বরে চালিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার ভাবি বন্ধুর স্ত্রী যিনি হতে চলেছেন, তিনি খুব সুবিধার মেয়ে হবেন না। আপনি হয়ত ভাবছেন আমি বিয়ে ভাংচি দিচ্ছি। কিন্তু তা মোটেই নয়। ভাংচি দিয়ে আমার কি লাভ বলুন। বরঞ্চ বিয়ে হয়ে গেলে পাড়ার লোক, গ্রামের লোক সকলেই বাঁচে। একটা মেয়ে পাঁচশো ছেলের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে, বুঝলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—ওখানে বন্ধুর বিয়ে দিতে কি আপনি বারণ করেন ?

ভদ্রলোক চক্ষু ছোট করে বললেন—আমি বারণ করবার কে ? মেয়ের স্বভাব খারাপ, গোপনে একজনের সাথে প্রেম করেন, অবশ্য লোক মুখে শুনতে পাই। তাই বললাম, আপনারা যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন। তবে আমার ছেলে, ভাই, আত্মীয় স্বজন যদি কেউ হ'ত তাকে আমি নিশ্চয় বারণ করতাম।

আমার মাথা ঘুরে গেলো, ভাবলাম, কি সর্ব্বনাশ। বাপ, মা জেনে শুনে অমন মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে কোন সাহসে ? আবার ভাবলাম। ভদ্রলোকের সাথে কন্যা পক্ষের নিশ্চয় কোন বিবাদ আছে। তাই জব্দ করবার মতলব নিয়ে এই সব জঘন্য মিথ্যা কথা রটিয়ে বেড়াচ্চেন।

সাহসে ভর করে বললাম, দীনবন্ধুবাবু বোধ হয় এতটা অভদ্র নন যে জুচ্চুরী ক'রে একজনের ঘাড়ে অমন মেয়েকে গছিয়ে দেবেন।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—ভদ্রলোক কি আর গায়ে লেখা থাকে মশাই, না, কথায় বোঝা যায়? ব্যবহারে বুঝতে পারবেন, মেয়ে হাজার বদমাইস কিংবা ভালো হলেও কোন বাপ মেয়েকে ঘরে রাখে বলুন তো?

ভীষণ ভাবনা আমাকে চেপে ধরল, মনের মাঝে নানান রকমের প্রশ্ন গড়া ভাঙ্গা সুরু হল। ভদ্রলোক যা বললেন—সত্যি কি?

ট্রেনখানি কত স্টেশনে থেমেছে, আবার চলেছে কত গ্রাম, মাঠ পার হয়েছে, আমার কিন্তু কোন ধারে খেয়াল নেই, কেবল ভাবছি, যা বললেন সত্যি কি?

কতক্ষণ এইভাবে বসে ছিলাম আমি নিজেই তা জানি না।

সামনের বেঞ্চির একজন বৈষ্ণব আমায় ডেকে বলল—কর্ত্তার কোথায় যাওয়া হবে?

চমকে উঠে বললাম, নবদ্বীপে।

বৈষ্ণব একটু হেসে বলল—আর ত গাড়ী যাবে না কর্ত্তা, এই ত নবদ্বীপঘাট শেষ স্টেশান, দেখছেন না সবাই নেমে গেছে।

চেয়ে দেখলাম, ট্রেনের কামরা সত্যিই প্রায় জনশূন্য।

বৈষ্ণব তাড়া দিয়ে বলল—নবদ্বীপ যাবেন তো শীঘ্র যান, না হলে পারে যাওয়ার নৌকা পাওয়া কষ্ট হবে, আর যদি কোনো মাঝি যেতে চায় তাহলে সে আপনার কাছ থেকে ডবল ভাড়া আদায় করে নেবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি যাবে না?

বৈষ্ণব উত্তর দিল—না কর্ত্তা, আমার এ পারেই ঘর।

নৌকার উদ্দেশে মেটে বালীর চড়া ভেঙ্গে দৌড়ালাম। নদীর কিনারে গিয়ে দেখি গোটা তিনেক নৌকা ঘাট ছেড়ে মাঝ গঙ্গায় পড়েছে। আর শেষ নৌকাখানি ছাড়বার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি নৌকাতে উঠে কোন রকমে ভিড় ঠেলে বসলাম। ভীড়ের মাঝে দেখি ট্রেনের ভদ্রলোক আসর জমিয়ে বসেছেন। আমায় দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন—ভাগ্য আপনার মশাই, ফেল করতে করতেও পাশ করে চলেছেন।

আর একজন বৃদ্ধ ট্রেনের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন —ব্যাপার কি?

ভদ্রলোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ব্যাপারটা কি হয়েছিল মশাই বলুন না পণ্ডিতকে?

বিরক্ত হয়ে বললাম—আপনিই বলুন! আমার বলার কোন প্রয়োজন দেখছি না।

পাশে আর এক পণ্ডিত চক্ষু বুজিয়ে ঝুলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে মালা জপছিলেন হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ঝুলি মাথায় ঠেকিয়ে বললেন—বাবাজী দেখছি নবাগত, না হলে ওঁর সামনে এত বড় কথা বলতে সাহস করত না। বুঝলে ?

ট্রেনের ভদ্রলোকটি দ্বিতীয় পণ্ডিতকে বললেন—যেতে দাও পণ্ডিত! উনি পুলিসের লোক, ওঁদের কথা কি ধরতে আছে।

অত বড় মিথ্যা কথাটা ভদ্রলোকের মুখে একটু আটকালো না, আচ্ছা ভদ্র লোক তো ?

দ্বিতীয় পণ্ডিত বিনীত ভাবে হাত জোড় করে বললেন—মাপ করবেন। আমি কি ছাই জানি যে আপনি সরকারের লোক। হরে কৃষ্ট, হরে কৃষ্ট। পুনরায় চক্ষু বুজে ঝুলির ভেতরে হাত ঢোকালেন।

ক্রমশ ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। সবার মত আড়াই পয়সা দক্ষিণা দিয়ে চড়ার বালি ভেঙ্গে সহরের পথেই সবার সাথে চললাম। কোন ফাঁকে ট্রেনের ভদ্র-লোক দল ছেড়ে সরে পড়েছেন আমি জানতেই পারি নি। মনে করেছিলাম, ভদ্রলোকটির বাড়ী যুগমাতলায়, কাজেই ওঁর পিছু পিছু গেলেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারব। কিন্তু এখন দেখছি নিজেকে খুঁজে বার করতে হবে। ছোকরা তো ট্রেন থেকেই সরেছে। আশা করাও পাপ, না করলেও উপায় নেই। যাহোক সহরে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—যুগোমাতলায় যাবো কোন ধার দিয়ে বলতে পারো ?

সে গদগদ ভাবে উত্তর দিল—প্রভুর এখনো সেবা হয় নি, তা আসুন না আমা-দের আদর্শ বাঙ্গালী হিন্দুর ভোজানলয়ে।

বুঝলাম, কানে কম শোনে। কাজেই আর একটু গলা চড়িয়ে বললাম—যুগোমাতলায় যাবো কোন ধার দিয়ে বলতে পারো ?

সে হেসে বললে—খরচ বেশী নয় ভাত দু পয়সা, ডাল এক পয়সা, মাছ…।

ভাবলাম, বধির লোকটির সাথে বৃথা বাক্যব্যয় না করে অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করলেই চলবে। সহরের মাঝে আরো এগিয়ে চললাম। সেই বধির লোকটি পেছন হতে চীৎকার করে বলছে, আমাদের এখানে ভালো থাকবার জেয়গাও আছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করতে যাবো, এমন সময় স্বয়ং বন্ধুর সাথে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেলো।

বন্ধু বললে, এত দেরী করে আসবার কোন দরকার ছিলো না। তার চেয়ে পাঁচ জনের মত অসুখের দোহাই দিয়ে একখানা পোষ্ট কার্ড লিখলেই পারতিস।

বললাম—বন্ধু তোমার বিয়ে আমার ত নয় কাযেই বুঝতে পারছ একদিন আগেই যা পরেও তা।

বন্ধু পিঠে চড় মেরে বলল- ফাজলামি রেখে চল, তোর জন্যে সবাই ভাবছেন। পথে যেতে যেতে ট্রেণের ভদ্রলোকটির কথা বার বার মনে এসে পড়ে, একবার ভাবলাম ভাল—বন্ধু তোমারো শেষকালে আয়ান ঘোষের মত অবস্থা না হয়, আবার ভাবি, বন্ধুর বাবাকে বলাই ভালো, বন্ধুর মনের আনন্দ এই কুৎসিত নরকের মাঝে এনে বিষিয়ে তোলা ঠিক নয়।

বন্ধুদের বাসায় পৌঁছতেই চারিদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন সুরু হল, বন্ধুর বিয়ে আমার এত দেরী নাকি ভীষণ অন্যায় হয়েছে, স্বীকার করলাম, মাপ চাইলাম কিন্তু টিটকারির হাত হতে রক্ষা পেলেম না। বন্ধুর বাবা বললেন—তিনটে প্রায় বাজে, স্নান করে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে নাও, পাঁচটার সময় আশীর্ব্বাদ করতে যেতে হবে, ট্রেণের ভদ্রলোকটির কথা আবার মনে পড়ে যায়, কি কুক্ষণেই তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল, বন্ধুর বাবাকে আড়ালে বলতে গিয়েও বলতে পারিনা, কোথায় বেধে যায়।

আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলো, বন্ধুর ভাবি-পত্নীকে দেখলাম, এমন সুশ্রী মেয়ে হাজারে একটা মেলে কি না বলা বড় শক্ত। এমন মেয়েকে ট্রেণের ভদ্রলোক কি করে জঘন্য উক্তি করলেন ? ভাগ্যকে যদি স্বীকাব করি তবে সেই ভাগ্যের উপর আস্থা রাখা আমার উচিত। একটি কথায় সুন্দরকে কেন অসুন্দর করবো? বন্ধুর পিতাকে আমি কিছুতেই অমন জঘন্য কথা বলিতে পারবো না।

কোথা দিয়ে রাত্রি কেটে গেলো, প্রভাতে শঙ্খধ্বনির আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায়, বন্ধুকে ঠেলা দিয়ে তুলে দিলাম, বন্ধু ঘুমন্ত অবস্থায় হাই তুলতে তুলতে বলল—যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।

বেলা বেড়ে চলে, গায়ে হলুদের পালাও শেষ হল, সারা দুপুর হৈ চৈ করে কাটিয়ে দিলাম। বিকেল বেলায় চা খেয়ে একটু বসতে যাবো, বন্ধুর বউদি এসে বললেন—ঠাকুরপো, বন্ধুটকে এবার বীর সাজে সাজিয়ে দিন।

অবাক হয়ে গিয়ে বললাম—এরি মধ্যে কি বউদি ?

বউদি হেসে বললেন গোধূলী লগ্নে বিবাহ—অরুণ সন্ধ্যায় মিলন হবে।

একটু ঠাট্টা করে বললাম—সাধে কি দাদা ফুলশয্যার রাত্রে আপনার নাম ছন্দা রেখেছিলেন! বউদি কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে বললেন—খবরদার ঠাকুরপো! বউদি চলে গেলেন, আমিও পিছু পিছু বন্ধুর সাজ ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

বরের সাজাবার পালাও শেষ হ'ল। বরযাত্রীরাও বরের আগেই সেজে তৈরি আছেন। দেখতে দেখতে বর ও নিতবর, পুরুত নাপিত সহ গাড়ীতে এগিয়ে গেল, আমরা বর যাত্রী বরের পিছু পিছু গিয়ে হাজির হলাম কন্যাপক্ষের গৃহে, সাক্ষী হিসাবে, সাক্ষীদের খাতির সর্ববত্রই, আদালতে যান দেখতে পাবেন সাক্ষীদের খাতির কি রকম, দলিল তৈরি করবার সময় সাক্ষীদের খাতির লক্ষ্য করবেন, আর মিথ্যে সাক্ষী হলে তো কথাই নেই।

পান, সিগারেট, চা, খেতে না খেতেই ডাক পড়ল– বরযাত্রীরা আসুন। আমরা বরযাত্রী বুক ফুলিয়ে কন্যা যাত্রীদের দিকে একবার তাকিয়ে চললাম খাবার মতলবে। যেমন মেল ট্রেণ ছুটে চলে, প্যাসেঞ্জার গাড়ীগুলি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

খাওয়ার পর বন্ধুর বাবার সাথে কথা বলছি, এমন সময় ট্রেনের সেই ভদ্রলোক দেখি কন্যার পিতার সাথে আমাদের দিকেই আসছেন, ভদ্রলোককে দেখে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেলো। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ছুটে গিয়ে তার হাত সজোরে চেপে ধরে বললাম—আপনি না দীনবন্ধুবাবুর মেয়ের নামে জঘন্য কলঙ্ক দিয়েছিলেন, আর তাঁরি বাড়িতে সাজ-গোজ করে খেতে আসতে লজ্জা করে না! বন্ধুর বাবা, দীনবন্ধুবাবু পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষ সকলে মিলে আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোক জনারণ্যের মাঝে গা ঢাকা দিয়ে পালালেন।

আরো বছর খানেক পরে বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, ট্রেনের ভদ্রলোকটি আর কেউ নয়, দীনবন্ধুবাবুর সহোদর ছোট ভাই, বন্ধুপত্নীর কাকা।

"একদিনের প্রয়োজনের বেশি যিনি সঞ্চয় করেন না আমাদের প্রাচীন সংহিতায় সেই দ্বিজ গৃহীকেই প্রশংসা ক'রেছেন। কেন না একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকেই বহুদূরে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমন কি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রাকৃতিক

(উপন্যাস)

প্রথম খণ্ড : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সরোজকুমার মজুমদার

"জানো! বাতাসের কান আছে, আছে তার তীব্র অনুভূতি!" সমস্ত চিঠিটার মধ্যে এই ক'টি কথাই হ'য়েছে অসম্ভব-রকম সুন্দর এবং অনুপম। তাই সুষমা শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো। এখন আটটা, আর আধঘণ্টা পরেই কালকের ডাকে দেওয়া তার চিঠি সুনীল পড়বে। প'ড়ে এই ছত্রটাই তাকে সবচে মুগ্ধ ক'রবে। স্নিগ্ধ হেসে সুনীল চিঠিটা আরো একবার প'ড়বে এবং প'ড়ে তারই মত আটবার দশবার আবৃত্তি ক'রবে। এই চমকপ্রদ কয়েকটী শব্দ: "জানো! বাতাসের কান আছে, আছে তার তীব্র অনুভূতি!" আর, কালকের সকালের ডাকেই সুষমা পেয়ে যাবে সুনীলের সুন্দর হাতের লেখা চিঠি! প্রথমেই দেখবে একেবারে সুরু ক'রেত সুনীল এই রকম: 'এই নিয়ে তিনবার চিঠি প'ড়লাম সুষমা। কী অদ্ভুত কথা কটী লিখেচো—বাতাসের কান আছে, আছে তার তীব্র অনুভূতি। সবাইকার কাছে এ-টা অস্বাভাবিক শোনাবে! কিন্তু আমিই আজ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করচি কথাটা কত সত্য!"

সুষমা নিজেই বিস্মিত হ'লো কী চমৎকার মুহূর্তে ওর প্রেরণা এসেচে এমন নিখুঁত ভাবে প্রকৃতিকে দেখতে। সুনীলের সঙ্গে এবার যেদিন দেখা হবে সেদিন তাকে এমনি আরেকটা কথা শুনিয়ে দিতে হবে। সুষমা মনে তাই ভাবতে থাকে। কিন্তু দেয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে সুষমা তাকিয়ে নিলো। মঙ্গলবার! এখনো অনেক দেরী। সেই রবিবারের আগে সুনীল আসতে পারবেনা—কি—জোর শনিবার! এ-হস্‌টেলের নিয়ম কানুনগুলো ভারী বিশ্রী। কেন বাপু, শনি কি রবিবার ছাড়া অন্য দিনে কী ভিজিটার আসতে পারবেনা? কেন? যদি বিশেষ দরকার থাকে? সত্যি, মেয়েদের প্রগতিই বলো আর যাই বলো, কাজে কিন্তু তারা সব জা'গাতেই আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বাঁধা। এর সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা দরকার! কালই, কাল কেন আজই, সে সিসটারের কাছে গিয়ে এ বিষয় কথা বলবে। বিকেলের দিকে তো কোন মেয়েরই ঘরে ব'সে থাকা দরকার হয় না। রোজই

তো বিকেলে তারা বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে পারে, বা আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে এসে দিব্যি নানা রকমের গল্প বা আলাপ করতে পারে, তা সে সব এ-হস্‌টেলে হ'বার উপায় নেই। যতো সব সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড।

এইতো শীলার চিঠি ও পরশু পেয়েছে। লিখেচে যে শুক্রবারে বিকেলে বীরেন বাবুকে কি দরকারে শীলা এখানে পাঠিয়েছিলো। ভদ্রলোক পয়সা খরচ ক'রে, সময় নষ্ট ক'রে এতদূর এসে গেট্ থেকে ফিরে গেলেন। তিনি তো জানতেন না এ-হস্‌টেলের কতগুণ!

বীরেনের সঙ্গে সুষমার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এর আগে ছিল না। অবিশ্যি, শীলাদের বাসায় ওর অবাধগতি আড়াই বছর থেকেই। বাড়ীর প্রতিটী প্রাণীর সঙ্গে ওর সুনিবিড় আত্মীয়তা ঘটে গেছে। কিন্তু বীরেনের সাথে এর আগে ও কদাচিৎ কথা বলেচে, সামান্য টুকিটাকি, ছাড়া-ছাড়া কথা, কাটা-কাটা। তা'র প্রথম কারণ দুজনের বয়স। বীরেনের আর সুষমার বয়স এমনি যে কোন বিশেষ কারণ বা উপলক্ষ্য না হলে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা গায়ে পড়ে পরস্পর আলাপ করে না, আর দ্বিতীয়তঃ বাড়ীর লোকের কাছে বীরেন যতই স্মার্ট হোক্ না কেন, মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ ক'রে অনাত্মীয়া বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে সে সহজ-ভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। তখন সে অসম্ভব রকম লাজুক হ'য়ে যায়। কিন্তু তুমি যদি ওর আত্মীয় হও, দেখবে ওর মুখে কথার খই ফুট্‌বে তোমাকে কারণে অকারণে ও হাসাবে, তোমার যে কোন বাস্তবিক বা কল্পিত দুর্ব্বলতা নিয়ে ও তোমাকে পরিহাসে পরিহাসে অস্থির ক'রে তুলবে। শেষ পর্য্যন্ত নানারকম অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দেখিয়ে তোমায় সাব্যস্ত ক'রে দেবে যে তুমি লোকটা কিছুই নও, জগতে এসেচো মিছিমিছি, অকারণে।

কিন্তু এবার ওদের বেশ ভালরকম পরিচয় হ'য়ে গেছে অনাদিবাবুর মধ্যস্থতায়। এমন পরিচয় হ'য়েছে যে দুজনে স্বচ্ছন্দে দুঘণ্টা আলাপ করতে পারে, কোন রকম সঙ্কোচ না ক'রে। গল্প করার জন্যে বীরেনের মত সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু বীরেন সেদিন এলো, অথচ ফিরে গেল।

সুনীল নিশ্চয়ই এর মধ্যে দেখা ক'রত আসবে না। ও এখানকার নিয়ম তো জানেই। ও একেবারে রবিবারের আগে আসবে—না, শনিবারেই আসবে। সুনীল বেশ ছেলে, সত্যি বলতে কি সুনীল ছেলেটা চমৎকার। আজ পর্য্যন্ত, যতদূর সুষমার স্মরণ হয়, সুনীল কখনো তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। বরঞ্চ সেই সুনীলের সঙ্গে অসম্ভব রূঢ় ব্যবহার ক'রেছে।

দাদার জন্যে সুনীলের কী আন্তরিক টান। সুষমার মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় দাদার জন্য ও যতটা কষ্ট পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী আহত হ'য়েচে সুনীল। মনে

মনে হিসাব ক'রে নিলো সুষমা প্রকাশের অন্তর্ধ্যানের পর সুদীর্ঘ সাত-মাস কাল নিঃশব্দে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—এই সাত-মাস সুনীলকে কী অমানুষিক পরিশ্রমই না করতে হ'য়েছে। রাণীগঞ্জে,—ঝরিয়া ফিল্ডে, ও যতো কয়লা কুঠি আছে, সে-সব জায়গায় তন্ন তন্ন খুঁজে এসেচে দাদাকে, কে ব'ললো, অমনি খবর পাওয়ামাত্র সুনীল সেখানে ছুটেছে যদি প্রকাশ সেখানে থাকে— যেখানেই কেন না সে আত্মগোপন ক'রে থাকুক, রোজগার তাকে তো করতেই হবে। এমনি ভাবে, সুষমা জানে, ভারতবর্ষের খুব কম সহর বা গ্রাম আছে যেখানে প্রকাশের সন্ধানে সুনীল ছুটে যায় নি। কিন্তু, আশ্চর্য্য, কোন দিন সুনীলের উৎসাহের বিন্দুমাত্র অভাব বা শ্রান্তি সে দেখে নি সুনীলের মুখে। হাসিমুখে সে নিজের দেহকে অবিশ্রান্ত কষ্ট দিয়ে বুভুক্ষিত প্রেতাত্মার মতো ছুটা-ছুটি ক'রে বেরিয়েছে চেরাপুঞ্জি থেকে কোয়েটা আর শ্রীনগর থেকে কুমারিকা। বাস্তবিক, সুনীলের মন যে কত উঁচু তা সুষমা অনুমানই ক'রতে পারেনা। দাদার কথা না হয় ছেড়েই দাও, আমার উপরেই বা তার ভালবাসা কী গভীর।

সুনীল ইচ্ছা ক'রলে, সুনীলের মতো যার এত রূপ, এত অর্থ, এমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং সবার উপরে এমন অন্তর, এমন ছেলের পক্ষে সুষমার চেয়ে অনেক ভালো স্ত্রী লাভ করা সহজ হ'তো। কিন্তু, সুনীলের প্রেম হালকা নয় মোটেও। সুষমাকে সুনীল ভালবাসে, এই কথাটাই সুনীলের কাছে সব: বাকী কিছুই এখানে স্থান পায় না। সুষমা ভাবে, সত্যিই সত্যিই তার মতো সুখী মেয়ে তোমরা পাবে না পৃথিবীতে। সুষমা জানে পৃথিবীতে আপনার ব'লতে ওর কেউই নেই; তবুও সুষমা এ-ও জানে সুষমার সুনীল আছে! পৃথিবীর কোন লোক, বা কোন কিছুতেই তার প্রয়োজন নেই, একমাত্র সুনীলকে অবলম্বন ক'রেই সে পরমশান্তিতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

দাদার কথা মাঝে-মাঝে মনে হয় বৈ কী? এমনি সময় দাদা থাকলে কী আনন্দই না হতো? তবে একটা আশঙ্কা এসে মনের ভিতরে উঁকি দিয়ে যায়—দাদা থাকলে সে কখনই সুনীলকে এমন ভাবে দেখতে পারতো না, সুনীলের অন্তরের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচিতি হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, তার হ'তো না কোনদিন।

দাদার খামখেয়ালীর জন্যই সে এর আগে সুনীলকে প্রত্যাখান ক'রতে বাধ্য হয়েছিলো। দাদার জন্য তার ভারী ভয় হয়েছিলো। দাদাকে একা ফেলে রেখে সে যে অন্য কারুর সংসারে গিয়ে প্রবেশ ক'রবে এ-চিন্তা সে কোনদিনই প্রশ্রয় দেয় নি।

দাদাকে সে এতদিনে অনেকটা ভুলতে পেরেছে। একটু-একটু তার কষ্ট হয় যখন দাদার কথা মনে হয় বা যখন ওর চোখ গিয়ে পড়ে প্রকাশের ঐ বড় ছবিটার দিকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে আর এখন ততটা একা মনে হয় না যতোটা হ'তো কিছুদিন আগে অর্থাৎ ছ-মাস আগেও।

সত্যি, প্রকাশ, যাই বলো, একপক্ষে ভালই ক'রেছে। প্রকাশ বিদায় নিয়েছে তার কাছ থেকে—হয়তো, এতদিনে পৃথিবী থেকেই প্রকাশ বিদায় নিয়ে চলে গেছে, কিন্তু সুষমার জীবনের গতি বদলে দিয়ে গেছে, সে তার অন্তর্ধ্যানের ভেতর দিয়ে। জিনিষটা যে-ভাবেই দেখ না কেন, শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখলে এটা সুষমার পক্ষে উপকারই হয়েছে। না, না, দাদাকে সে উপেক্ষা করছে না—

দাদা ফিরে আসুক, সেইটেই সবচেয়ে কামনীয়। কিন্তু, দাদা বেঁচে থাক, তবুও, দাদাকে পাওয়ার পরিবর্ত্তে যদি সুনীলকে হারাতে হয়, এ বিনিময় সহ্য করতে পারবে না সুষমা। দাদার জন্যে সে কেঁদেছে কদিন কি কুৎসিত ভাবেই না সে কেঁদেছে—কিন্তু দাদা নিষ্ঠুর—তার এতটুকু মায়া হয় নি ওর জন্যে। সে ফিরে এলো না—সাত মাস কেটে গেছে, দাদা সুষমাকে ছেড়ে হয়তো দিব্যি আছে। নিশ্চয়ই, নইলে সে না ফিরে এসে থাকতে পারতো না।

কিন্তু দাদা ফিরে আসবেই। সেদিন এক জ্যোতির্ব্বিদ এসেছিলেন শীলাদের বাড়ীতে। কি চমৎকার সৌম্য ওঁর চেহারা, আর তাঁর দৃষ্টি, তাঁর চোখের দৃষ্টি। যেন দুই জ্বলন্ত চোখ ঠিকরে উজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, জ্ঞানের দীপ্তি। সে দৃষ্টি অন্তরের গোপন খবরটুকু টেনে বের ক'রে নেয়। এমন যাঁর চোখ, তাঁর কাছে তো কিছুই অজানা থাকতে পারে না। তিনি যা ব'লেচেন তা-যে নিশ্চয়ই সত্যে পরিণত হবে এ-বিশ্বাস সুষমার আছে। শুধু সুষমার কেন, যিনিই তাঁকে দেখেচেন তিনিই এ কথা স্বীকার করবেন।

অনাদিবাবু সাহেব হ'লে কী হবে, প্রাচ্য-জ্যোতিষে আস্থা তাঁর প্রচুর। বাড়ীর ছেলেমেয়ে সবাইকে টেনে এনে বলেছেন,– হাত বার কর।

জ্যোতির্ব্বিদ একবার সুষমার দিকে চাইলেন, ঠিক্ সেই দৃষ্টি! এই দৃষ্টির কাছে কিছুই অজানা নাই। আয়নার কাঁচে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাঁর চোখের সাম্নে স্বচ্ছ হ'য়ে দেখা দেবে।

সুষমার দিকে দৃষ্টি প'ড়তেই খপ করে ওর বাঁ-হাত টেনে নিলেন নিজের কাছে। তারপর ওর কররেখার প্রতি দৃষ্টি রেখে ব'লে গেলেন, সমস্তই ব'ললেন, সব কথা। বাবা কবে মারা গেছেন—কী ক'রে মার অপমৃত্যু হ'লো। প্রকাশের কথাও ব'ললেন। ব'ললেন, কন্যা লগ্ন তোমার, নৈমার্গিক ভাবে মঙ্গল ভ্রাতৃকারক গ্রহ, তার উপরে তোমার কন্যালগ্নের তৃতীয় পতি অর্থাৎ ভ্রাতৃস্থানের অধিপতি স্বয়ং মঙ্গল। তিনি আবার রন্ধ্রগত শনিদ্বারা পূর্ণ

দৃষ্ট হ'চ্ছেন—পীড়িত হ'য়ে আছেন, আর এখন তুমি সেই শনির দশাই অতিক্রম ক'রছো। যে মাসে তোমার দাদা চ'লে গেছে বাড়ী ছেড়ে, কী নির্ভুল জ্যোতিষ শাস্ত্র লক্ষ্য করো, এই দেখ মঙ্গল রেখা, দেখছো তো? হ্যাঁ, শনির দশায় যে-মাসে মঙ্গলের অন্তর প'ড়েছে, অমনি উনি, তোমার দাদা, গেলেন বাড়ী ছেড়ে চ'লে। যেতেই যে হবে ওঁকে। উনি যান নি—উনি হ'চ্ছেন মঙ্গল গ্রহ, শনি ওঁকে তাড়িয়েছে।

এত কথা, এত মিল। শুনে সুষমার বুক ঢিব-ঢিব ক'রে উঠ্‌লো। রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, তবে উনি আর কোন দিন আসবেন না?

—আসবেন। জ্যোতিষজ্ঞ ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ব'ললো—নিশ্চয়ই আসবেন। এইতো মঙ্গলের অন্তর কেটে বুধ পড়লেই আসবেন।

—সে আর কত দিন?

—সামান্য, মাস ছয় আর কী! মৃদু হেসে জ্যোতির্ব্বিদ ব'ললেন। সবাইকার হাত দেখা হ'য়ে গেলে সাহস ক'রে সুষমা ওঁকে ব'ললো,—তা হ'লে এইটে জেনে রাখবো যে আপনি যদি জ্যোতিষ শাস্ত্র কিছু মাত্রও জানেন, তবে আমার দাদা ফিরে আসবে।

তিনি বীভৎস ভাবে হেসে উঠলেন। এ-হাসিতে পর্য্যন্ত মানুষের বুক শুকিয়ে ওঠে।—আসবে, আসবে! আমি জ্যোতিষ জানি কি জানিনা এ প্রশ্ন ছেড়ে দাও; জ্যোতিষ শাস্ত্র সত্য কি মিথ্যা, এ তর্কও এখন নয়। তবে জেনে রাখো কল্যাণি, ওর মাথায় হাত রেখে তিনি ব'লেছিলেন তেমনি দৃপ্ত কণ্ঠে, জেনে রাখো কল্যাণি, যদি রাত্রির পরে সূর্য্য ওঠে, আর দিনের পরে চাঁদ, তবে আমার এ-কথাও সত্য হবে। তোমার দাদা ফিরে আসবে। বেশী দিন নয়, এই মঙ্গলের অন্তরটা কেটে গেলেই।

তাই সুষমা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে দাদা আসবেই। দাদা এসে শুনবে, সুনীলের ও বাগ্‌দত্তা বধূ হ'য়ে গেছে। তারপর শীলার সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়ে ও আর সুনীল নিজেদের স্বর্গীয় সংসার বাঁধবে। অপূর্ব্ব!

দেয়ালে টাঙ্গানো প্রকাশের নূতন ছবিটার দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন ক'রলো, তুমি আসবে না দাদা?

প্রকাশ দু-দিকে ঘাড় নাড়লো।

না? তার মানে? তবে আমি কিন্তু তোমার জন্যে দেরী করবো না? পরীক্ষা হ'য়ে গেলেই সুনীলের সঙ্গে—বুঝলে তো?

প্রকাশ ঘাড় নেড়ে জানালো, সে বুঝেচে।

সুষমা দু-পা এগিয়ে গিয়ে ছবিটার ঠিক নীচে দাঁড়ালো,—দুষ্টুমি হচ্ছে, না? তুমি

আসবে। আমি জানি। নইলে উনি কী আর মিছে ব'লবেন? রাতের পরে তো রোজই এই ঝাঁঝালো সূর্য্য উঠ্‌বে আর দিনের পরে চাঁদ! তুমি ফিরে আসবে, নিশ্চয়ই! না?

এবার প্রকাশ ঘাড় কাৎ ক'রলো।

—তবে যে বড়ো? সুষমা বিজয়িনীর দৃষ্টিতে চাইলো প্রকাশের দিকে, প্রকাশের বড় ছবিটার দিকে, জানলার উপর দেওয়ালের গায়ে সেটা টাঙ্গানো আছে!

আবার এসে ও নিজের বিছানার উপরে ব'সলো। কী জানি কেন, আজকে ওর নিজেকে ভারী ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে। সুনীলের কথা মনে হলেই ও নিজেকে অনেক উঁচুতে তুলে নিতে পারছে। কিন্তু সুনীলের সাথে ওর মিলন হওয়ার আগেই যদি ওর মৃতু হয়? কিন্তু কেন? কেনই-বা ওর অকস্মাৎ মৃত্যু হবে? কোন অপঘাতেও তো হঠাৎ হ'য়ে যেতে পারে! কী বিশ্রী চিন্তা এসে মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো। অবসন্ন দেহে ও বিছানার মধ্যে এই অসময়ে শুয়ে প'ড়লো। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল যতো সব অমঙ্গলের কথা নিয়ে নিজের মনে আলোচনা সুরু করলো।

ছাতে সিলিংএর প্রতি বিশেষ ভাবে ওর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো। তাইতো? এত বড় প্রকাণ্ড বিল্ডিংএর উপরেও আরো দু-তলা রয়েচে—আর এই ছাতে কিনা কড়ি-বরগা নেই! কী আশ্চর্য্য! ভেঙে পড়তে কতক্ষণ। এর উপরে আরো দুটো তালা আছে, অথচ অথচ ছাতের স্থিলিংএ কড়ি-বরগা নেই। কীসে অবলম্বন ক'রে বাড়ীটার ছাত খাড়া হয়ে আছে? হঠাৎ, রাত্রে যখন সে ঘুমিয়ে থাক্‌বে, তখন যদি হঠাৎ ছাতটা ভেঙ্গে ওর উপরে পড়ে? উঃ, তা হলে আর বাঁচতে হবে না। ঈশ্বর, আরো কিছুদিন আমায় বাঁচিয়ে রেখো—মিনতি জানাচ্ছি। একদিন, শুধু একদিনের জন্যও যদি আমি সুনীলকে আমার বলে পাই সেই আমার যথেষ্ট, তার পরে তোমার তূণে যতো তীক্ষ্ণ শর আছে সমস্তগুলি উজাড় করে নিক্ষেপ ক'রো আমার প্রতি। অমাকে যদি বাঁচতে না দাও, তা'তে আমার বিন্দু মাত্রও ক্ষোভ নেই শুধু আরো কটা মাস আমি বাঁচতে চাই।

কিন্তু কেন? ঘরের স্থিলিং তো সে আজ ক-মাস থেকেই দেখছে, এর আগে তো কখনো এমন অমঙ্গলের আশঙ্কা তার মন পীড়িত করে নি? হঠাৎ আজই বা তার কেন এ-কথা মনে হলো যে ছাত ভেঙ্গে পড়তে পারে? পারে বৈকি? রাত্রে কেন? এই মুহূর্ত্তেও তো এ-রকম দুর্ঘটনা হ'তে পারে। নাঃ, এ ঘরে থাকা আর নয়।

ত্রস্তে সুষমা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো। অসীম ক্ষিপ্রতার সহিত দেরাজ খুলে সুনীলের একটা ছোট ফোটো বের ক'রে নিয়ে ভীত ভাবে স্থিলিঙের দিকে চাইলো। যাক্‌,

এখোনো ভাঙেনি। কিন্তু আর একটুও নয়। আড়ষ্ট ভাবে সে দরোজা দিয়ে ছুটে যেই বাইরে বেরুতে যাবে অমনি শতদলের সঙ্গে বুক ঠোকা-ঠুকি হ'য়ে গেল।

—উঃ! শতদল ওকে থামাবার চেষ্টা ক'রে ব'ললে, কীরে অতো ছুটে কোথায়? ভয়ঙ্কর লেগেছে।

ফ্যাকাশে মুখ ক'রে সুষমা ওকে শুধোলো,—তোদের ঘরের সিলিং কেমন?

শতদল কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ব'ললো,—সিলিং কী রকম মানে?

—কড়ি-বরগা নেই? ভেঙ্গে প'ড়বে না তো?

—পাগল, ভাঙবে কেন রে? ও-যে কংক্রিট্ করা। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শতদল ব'ললো: ওদিকে যাচ্ছিলি কোথায়?

—ওদিকে? যাচ্ছিলাম—না, না এমনি ওদিকে যাচ্ছিলাম। ভয়ানক অস্বাভাবিক কণ্ঠে সুষমা ব'ললো।

শতদল ওর হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে বসলো।

যখন লক্ষ্য ক'রলো যে সুষমা তখনও স্বাভাবিক সহজ অবস্থায় আস্‌তে পারে নি, তখন সে ব'ললো,—এরই জন্যে এত ভয়? এতদিন তবে পড়ে যায়নি কেন? বরঞ্চ এ কংক্রিটের ছাত তোদের ঐ হ্যাকনিড্ কড়ি-বরগার চেয়ে লক্ষ গুণে মজবুত, তা জানিস? আর এই একটা কল্পিত জিনিষ নিয়ে তোর এমন শঙ্কা, এমন ভীরু তুই? ম'রতে ভয় কি, শতদল শরচ্চন্দ্র "কোট্" করে বললো, আর মরতে তো একদিন হবেই।

সুষমা এতক্ষণে একটু যেন আশ্বস্ত হ'লো। সত্যি, সে কি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো নাকি? সতেরো বছরে যে-ছাতে এতটুকু ফাটল ধরেনি, ও অমূলক আশঙ্কা করেছে সেই ছাত যখন-খুসী ভেঙ্গে পড়বে? আর তাই নিয়ে একটু আগে কি ছেলে মানুষিটাই না হ'য়ে গেল! আর সেই বা হঠাৎ ম'রবে কেন? কী আশ্চর্য্য? সুষমা অল্প একটু হেসে ফেললো। বীরেনের সুমুখে এমনি হাসলে বীরেন ব'লতো, আপনি কোয়ার্টার ইঞ্চি হাসলেন।

—দেখি, দেখি, কার ছবি? শতদল সুনীলের ফোটোটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিলো!

—বলবো কেন? দে, দে বলছি আমার ছবি।

সুষমা একটু আগ্রহ দেখিয়ে বললো।

—দিচ্ছি, কার ছবি বল আগে?

—ব'লবো না।

—তবে এই আমি চললুম মিনুদিদের ব'লতে তুই কেমন হঠাৎ ভয়ে পেয়ে গিয়েছিলি ছাত ভেঙ্গে পড়বে বলে। শতদল ভয় দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌তে উদ্যত হ'লো।

—বলগে যাঃ, অসভ্য মেয়ে। দেনা আমার ছবি!

—দিচ্ছি, বোস্, একেবারে মিনুদির হাতেই দিচ্ছি। শতদল সত্যিই কপাটের দিকে নিজেকে চালিত করেচে দেখে সুষমা ঘাবড়ে গেল। উঠে গিয়ে, শতদলকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো স্ব-স্থানে। টেবিলের উপর থেকে একটা কৌটো খুলে কতগুলো চকোলেট্ বের ক'রে শতদলের কোঁচোড়ের উপর ফেলে দিয়ে বললো,—নে খা, কী বোকা মেয়েরে তুই! বোকা ঠিক ন'স্। এক কথায় ছেলেমানুষ। কেন? ও লোকটা কে জেনে তোর পা গজাবে নাকি? ভারী মনে ধরে গিয়েছে বুঝি? চেহারাটা কেমন? শুনবি ও আমার কে? শুনবি? ব'লে নিজেই শতদলের মাথাটা খানিক এগিয়ে নিয়ে এসে চুপি-চুপি ব'ললো,—ওর নাম সুনীল চৌধুরী, ও আমার, কী ব'লবো, কী ব'লবো, ও আমার—

শতদল উজ্জ্বল হাসিতে বিকশিত হ'য়ে উঠলো—সত্যি? এতও জানিস তুই? থাকিস তো দিব্যি ফিট্-ফাট ভাল মানুষটীর মতো, আবার এদিকে একটা ইয়ে জোটানোও হয়ে গেছে? বেশ, বেশ! তারপরে সুনীলের ফোটোটা বেশ ক'রে আরো খানিক নিরীক্ষণ ক'রে ব'ললো—যাক, তোর টেস্ট আছে। ভদ্রলোকের কাঁধটা বেশ চওড়া। এমনি স্বাস্থ্যই আমার পছন্দ।

সুষমা একটু গর্ব্ব অনুভব করলো—সস্নেহে শতদলের গাল টিপে দিয়ে ব'ললো,—পছন্দ হ'লেও তো কোনো উপায় নেই ভাই। হাত ছাড়া হ'য়ে গেছে! তোমার সামান্যও আশা নাই।

বয়ে গেছে আমার! ভারী তো চেহারা। চোখ-দুটো যে কী বিশ্রী! ঘৃণায় শতদল সন্ধ্যাবেলাকার পদ্মের মতো যেন কুঁকড়ে গেল।

—থাক তাই ভালো। সুষমা কিছু বলতে যাচ্ছিলো এমন সময় এক দঙ্গল মেয়ে সুষমার ঘরে ঢুকে প'ড়ে সবাই এক সঙ্গে ব'লতে লাগলো,—আজ সবাই আমরা রাঁধবো,—তোরা আয়।

বেলা ব'ললো—কী হচ্ছিলো রে তোদের মধ্যে। শতদল উঠে পড়ে গৌরীর দিকে এগিয়ে যেতেই সুষমা বললো—বলিস নি শতদল বারণ করছি।

শতদল সে কথা আরেক কাণ দিয়ে বের ক'রে দিয়ে ব'ললো জানিস, অরুণ! সুষমার এরই মধ্যে কোর্টশিপ্ হ'য়ে গেছে। বিলাভেডের ছবি দেখবি, দেখবি তোরা?

সুনীলের ছবির জন্য দোতলার ছোট ঘরের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে গেল।

অতগুলো মেয়ের লাফালাফি, ঝাঁপটা-ঝাপটী, ধাক্কা লেগে একটা চেয়ার উল্‌টে পড়লো। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, অরুণা আর রেণুকার বুকের মধ্যে চাপা পড়ে এই কথাটাই সুষমার অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল, কী আশ্চর্য্য, এত আলোড়নেও ছাত তো ভেঙ্গে প'ড়লো না!

তাই ও শত্রুদের কবল থেকে সুনীলকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে নিজের মনে আরেকবার এই কথাকটী আবৃত্তি ক'রতে লাগলো,—বাতাসের কান আছে, আছে তার তীব্র অনুভূতি।

(ক্রমশ)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

"সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এ রূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই।...মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু. স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।"---বঙ্কিমচন্দ্র

আমার জীবন

(শেষখণ্ড)

গোপাল ভৌমিক

৮

একদিন একটু অধিক রাত্রে যখন আমি ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌নার বাড়ী থেকে ফির্‌লাম তখন আমি একজন নতুন পোষাক পরা পুলিশকে আমার ঘরে দেখ্‌লাম ; সে টেবিলে ব'সে পড়্‌ছিল। "অবশেষে!" সে আড় মোড়া দিয়ে উঠে ব'সে বল্‌ল। "এই তৃতীয় বার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। শাসন কর্ত্তা আগামীকল্য ঠিক নয়টার সময় আপনাকে গিয়ে দেখা কর্‌তে ব'লেছেন। দেরী কর্‌বেন না যেন।"

আমি যে শাসন কর্তার আদেশ মান্‌ব এ বিষয়ে সে আমার একটা লিখিত প্রতিজ্ঞা পত্র নিয়ে গেল। পুলিশের আগমনে এবং শাসন কর্তার অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণে আমাকে কেন যেন দমিয়ে দিল। ছোটবেলা থেকে আমি পুলিশ এবং সরকারী কর্মচারীদের বড় ভয় কর্‌তাম ; আমি এত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌লাম যেন আমি সত্যই কোন অপরাধ ক'রেছি। রাত্রিবেলা আমার ঘুম হ'ল না। আয়া এবং প্রকোফিও উদ্বিগ্ন ছিল—তাদেরও ঘুম হ'ল না। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আয়ার কান ব্যথা করছিল—সে গোঙ্‌রাচ্ছিল—কয়েক বার ত সে চীৎকারই করে উঠ্‌ল। আমি ঘুমাতে পার্‌ছিনা শুনে' প্রকোফি একটা ছোট বাতি নিয়ে চুপ ক'রে আমার ঘরে ঢুক্‌ল এবং টেবিলে এসে বস্‌ল।

"তোমার কিছুটা পেপার্‌ব্রাণ্ডি খাওয়া উচিত" সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্‌ল। "এই চোখের জলের উপত্যকায় একটু মদ খেলেই সব ঠিক হ'য়ে যায়। মার কানে যদি কিছুটা পেপার্‌ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দেওয়া যায় তবে তাঁর কানও ভাল হ'য়ে যাবে।"

গোটা তিনেকের সময় সে কসাই খানায় কিছু মাংস আন্‌তে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল। আমি জান্‌তাম যে সকাল পর্যন্ত আমার ঘুম হ'বে না—তাই নয়টা পর্যন্ত সময়টা কাটানোর জন্য আমি তার সাথে চল্‌লাম। আমরা একটা লণ্ঠন নিয়ে হেঁটে চল্‌লাম—তার তের বৎসর বয়স্ক বালক ভৃত্য নিকোল্‌কা পিছনে পিছনে স্লেজ্ হাঁকিয়ে চল্‌ল ; সে ভাঙ্গা গলায় ঘোড়াকে গাল দিচ্ছিল—তার মুখে নীল দাগ এবং মুখের ভাব হত্যাকারীর মত।

"শাসনকর্তা তোমাকে হয়ত শাস্তি দেবেন" হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে প্রকোফি বল্‌ল। "শাসনকর্তার পদমর্যাদা আছে, ধর্ম যাজকের পদমর্যাদা আছে, কর্মচারীর পদমর্যাদা আছে, ডাক্তারের পদমর্যাদা আছে এবং সব ব্যবসায়েরই পদমর্যাদা আছে। তুমি তোমার পদমর্যাদা রেখে চল না—তা' ও'রা অনুমোদন করবেন না।"

গোরস্থানের পরে কসাইখানা—এর আগে আমি দূর থেকে কসাইখানা দেখেছি মাত্র। ধূসর বেড়া দেওয়া তিনটি ছোট ঘর নিয়ে কসাই খানা—গ্রীষ্মকালে যখন সেইদিক থেকে বাতাস বইত তখন একটা হ্যক্কার জনক দুর্গন্ধ ভেসে আস্‌ত। এখন উঠানে ঢুকে আমি অন্ধকারে ঘরগুলি দেখ্‌তে পেলাম না; আমি ঘোড়া এবং খালি ও মাংস ভর্তি স্লেজের মধ্যে হাত্‌ড়ে বেড়াতে লাগ্‌লাম; লণ্ঠন হাতে নিয়ে লোক সব হেঁটে বেড়াচ্ছিল আর ঘন ঘন শপথ করছিল। প্রকোফি এবং নিকোল্‌কাও বিশ্রী ভাবে শপথ করতে লাগ্‌ল- শপথ, কাসি এবং ঘোড়ার ডাক মিলে একটা অদ্ভুত নিরবিচ্ছিন্ন গুঞ্জন ধ্বনির সৃষ্টি করছিল।

জায়গাটাতে মৃতদেহ আর পচা মাংসের গন্ধ; কাদা মাখা বরফ গলা সুরু ক'রেছিল এবং অন্ধকারে আমার মনে হ'ল যে আমি রক্তের নদীর মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম।

মাংস দিয়ে স্লেজ্‌টা বোঝাই ক'রে আমরা বাজারে কসায়ের দোকানে গেলাম। ভোর হ'তে আরম্ভ ক'রেছিল। একটির পর একটি ক'রে পাচক আস্‌তে লাগ্‌ল ঝুড়ি হাতে—বুড়িরা এল গরম পোষাক প'রে। একহাতে একখানা কুড়াল নিয়ে শাদা রক্ত মাখ পোষাক প'রে প্রকোফি ভীষণ ভাবে শপথ করতে লাগ্‌ল—সে গির্জার দিকে ফিরে ক্রশ আঁক্‌তে লাগ্‌ল এবং এত জোরে চীৎকার করতে থাক্‌ল যে সে কেনা দামে এমন কি ক্ষতি ক'রেও মাংস বেচে। সে ওজনে এবং গোণায় খরিদ্দারদের ঠকাত—পাচকরা বুঝতে পারত কিন্তু তার জোর গলার চীৎকারের ফলে তারা প্রতিবাদ করতনা, তারা শুধু তাকে বল্‌ত 'ফাঁসি কাঠের পাখী'।

তার ভয়ঙ্কর কুঠার খানা নামিয়ে এবং উঠিয়ে সে চমৎকার ভঙ্গী করতে লাগ্‌ল এবং ভীষণ একটা মুখভাব ক'রে সে ঘন ঘন বল্‌তে লাগ্‌ল 'হাক্'—আমার ত ভয়ই হোল কখন কার মাথা কিংবা হাত কেটে ফেলে।

আমি সমস্ত সকালটা কসায়ের দোকানেই কাটালাম এবং অবশেষে যখন শাসন কর্তার বাড়ী গেলাম তখন আমার ফার্‌কোটে মাংস আর রক্তের গন্ধ। আমার মানসিক অবস্থা ছিল একটা লাঠি মাত্র সম্বল ক'রে ভালুকের সম্মুখীন হবার উপযুক্ত। আমার মনে পড়ে একটা লম্বা সিঁড়িতে ডোরা-কাটা কার্পেট পাতা ছিল, একজন যুবক কর্মচারী ছিল ফ্রক্ কোট্ পরা—তার জামার বোতাম গুলি চক্‌চক্ করছিল—সে আমাকে নিঃশব্দে

দরজা দেখিয়ে দিয়ে ভিতরে গেল খবর দিতে। আমি হলের ভিতরে ঢুকলাম—ঘরের আসবাব পত্র গুলো খুব সৌখীন কিন্তু প্রাণহীন, রুচিহীন—কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়া—লম্বা সংকীর্ণ কাচগুলো, জানালায় হলদে পর্দা টাঙানো; যে কেউ সহজে বুঝ্‌তে পার্‌ত যে শাসন কর্তা বদ্‌লালেও আসবাব পত্র ঠিক থাকে। যুবক কর্মচারিটি আবার দুই হাত দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল আমি একটা বৃহৎ সবুজ টেবিলের দিকে গেলাম—সেখানে ভ্লাডিমিরের অর্ডার পরিহিত একজন সেনাপতি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"মিঃ পলোজ্‌নিভ্‌" তিনি হাতে একটা চিঠি নিয়ে বল্‌লেন; তিনি বেশী হাঁ করায় তাঁর মুখ থেকে গোলাকার 'ও' উচ্চারণ বেরুলো। "আমি আপনাকে এই কথা বলার জন্য ডেকে ছিলাম: আপনার মাননীয় পিতা মুখে এবং চিঠিতে প্রাদেশিক ভদ্রসম্প্রদায়ের শাসন কর্তাকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে আপনাকে ডেকে এনে আপনি যে অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে হ'বার সম্মানের অধিকারী হ'য়েও অনুরূপ ব্যবহার কর্‌ছেন না তা যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মহামান্য আলেকজ্যাণ্ডার প্যাভ্‌লোভিশ্‌ যথার্থ-ই ধ'রেছেন যে আপনার আচরণ বিপ্লব মূলক হ'তে পারে এবং কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ব্যতীত শুধু মাত্র অনুনয়ে কাজ হ'বে না মনে ক'রে আপনার বিষয়ে আমাকে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে একমত!"

তিনি শান্তভাবে সসম্মানে সোজা দাঁড়িয়ে কথা গুলো বল্‌লেন যেন আমি তাঁর উর্দ্ধতন কর্মচারী এবং তাঁর মুখভাবে কিছুমাত্র কঠোরতা ছিল না। তাঁর মুখের মাংস ঝোলা—মুখে বিষণ্ণতার ছাপ আর বলীরেখা—চোখের নীচে মাংসের থলী। তাঁর চুলে কলপ দেওয়া—তাঁর চেহারা দেখে তাঁর বয়েস পঞ্চাশ কি ষাট নির্দ্ধারিত করা মুস্কিল ছিল।

"আমি আশা করি" তিনি ব'লে চল্‌লেন, "আপনি আলেক জ্যাণ্ডার্‌ প্যাভ্‌লোভিশের আমার কাছে এই ব্যক্তিগতভাবে আবেদনের বদান্যতা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আমি আপনাকে শাসন কর্তা হিসাবে নয় ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ ক'রেছি—আপনার পিতার অনুরাগী হিসাবে আমি এ আমন্ত্রণ ক'রেছি। আমি আপনাকে আপনার আচরণ বদ্‌লাতে বলি এবং আপনার পদ মর্যাদার উপযুক্ত কাজে ফিরে যেতে বলি কিংবা আপনার আদর্শের কুফল এড়ানোর জন্য আপনাকে অন্যত্র যেতে বলি যেখানে আপনাকে কেউ চেনে না এবং যেখানে আপনি ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু করতে পার্‌বেন। তা'নইলে আমাকে চরম পন্থা অবলম্বন করতে হ'বে!" তিনি আধ মিনিট ধ'রে নীরবে আমার মুখের দিকে হা ক'রে চেয়ে রইলেন। "আপনি কি নিরামিষাশী?" তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন।

"না হুজুর, আমি মাংসাশী।"

তিনি ব'সে প'ড়ে একটা দলিল তুলে নিলেন—আমি অবনত হ'য়ে অভিবাদন জানিয়ে চ'লে এলাম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে কাজে গিয়ে লাভ ছিল না। আমি বাড়ীতে গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কসাই খানার অপ্রীতিকর এবং অস্বাস্থ্যকর ভাব এবং শাসন কর্তার সঙ্গে আলাপের ফলে ঘুম এল না। এই অবস্থায় কোন রকমে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটালাম তারপর বিষণ্ণতা এবং অস্বস্তি অনুভব করায় ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্না্র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি তাকে শাসন কর্তার সঙ্গে আলাপের কথা বললাম—সে বিব্রত ভাবে আমার দিকে তাকাল যেন সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না; তারপর হঠাৎ উপচে-পড়া আন্তরিক হাসিতে সে ফেটে পড়্ল যে-হাসি শুধু সদাশয় তরল হৃদয় লোকেরাই হাসতে পারে।

"এ কথা যদি পিটার্সবার্গে বল্‌তাম!" সে টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে হাসিতে গড়িয়ে পড়্‌তে পড়্‌তে বল্‌ল। "যদি পিটার্সবার্গে এ কথা বলতে পার্‌তাম!" (ক্রমশ)

> "যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানব-লীলা আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়দের জন্যে অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-স্মরণ

হরেন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথকে আর দেখিতে পাইব না। ইহা চিন্তা করিতেও ব্যথা লাগে। সর্ব্বদাই মনে হইতেছে তিনি কোনার্ক শ্যামলী-পুনশ্চ বা উদীচীর কোন না কোন ঘরে, তাঁর অতি প্রিয় আরাম কেদারায় বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন নয়ত কাব্য রচনায় বিভোর হইয়া আছেন। ছুটির ফাঁকে শান্তিনিকেতন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলেই রবীন্দ্রনাথকে আবার দেখিতে পাইব। তাহা কি সম্ভব? তিনি যে চিরদিনের মত এ দেহজগত হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজ পরিবারে জন্ম হইল তাঁর। রাজোচিত ভাবে জীবন যাপন করিলেন, কর্ণের মত দান করিলেন রস-বিদ্যা, নিদ্রিত দেশবাসীর ঘুমঘোর কাটিল তাঁর সঙ্গীতের সুরে, প্রাণস্পর্শী ভাষায়। বিপ্লবের দিনে আগুয়ান ঋনিকের মত তাঁর বাণী প্রচারিত হইল, কুটীরে কুটীরে প্রতিধ্বনিত হইল সে কথা, দেশ বিদেশের লোক শুনিল সে বার্ত্তা। কবির আহ্বানে সাড়া দিল পৃথিবীর লোক। য়ুরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, সারা জগত পরিভ্রমণ করিয়া তিনি তাঁর দেহ দান করিলেন, প্রাপ্য সম্মান গ্রহণ করিলেন। দিকে দিকে ভারতের কলঙ্ক কালিমা মুছিয়া গেল। জগতের বিভিন্ন আসরে স্থান হইল ভারতের।

জাতিভেদবাদের সময়, ধর্ম্মবিপ্লবের সময়, নারী জাগরণের মূলে, পল্লী সংস্কার ও পল্লীশিক্ষা বিস্তারের প্রথম যুগেও রবীন্দ্রনাথের কথাই সকলের মনে পড়িবে। য়ুনিভার্সিটির সকল শিক্ষাই যাহাতে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া হয় তাহার জন্যও রবীন্দ্রনাথের কত না চেষ্টা, কত চিন্তা।

ঋষি বঙ্কিম যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দকে যিনি নমস্কার করিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী যাঁহাকে গুরুদেব পদে অভিষিক্ত করিলেন আমাদের সবাকার সেই রবীন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই, ইহা ভাবিতে পারা যায় না।

বিশ্বমানবের কল্যাণকামনাই যাঁর লক্ষ্য ছিল, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, বিশ্ব-ভারতী যাঁর নিজের সৃষ্টি, মুক্তির জন্য শক্তির বিরুদ্ধে আজীবন যাঁর সংগ্রাম, দেশকে সদা জাগ্রত রাখার জন্য নিত্যনবছন্দের বাণী যাঁর সেই শক্তিমান মহাপুরুষের অন্তর্ধানে দেশবাসী আজ মর্ম্মাহত।

দেশের শিক্ষার জন্য নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও ত্যাগী রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই। জীবনের অন্তরতম সাধনা চারুকলার প্রচারকল্পে শেষ জীবনেও বিভিন্ন প্রদেশে গীতি-নাট্য অভিনয়ের আয়োজন আহ্বান করিয়া যে অর্থভাণ্ডার সংগৃহীত হইত তাহার শেষ কপর্দকটী পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।

আজ দেশময় যে নৃত্যরসসুধা পান করিয়া ভারতবাসী ধন্য প্রথমে এই লীলায়িত দেহ-ভঙ্গিমার প্রচারকল্পেও রবীন্দ্রনাথকে কত কটুবাক্যই সহিতে হইয়াছে। তবুও রূপ-রস-গন্ধের পূজারী, সত্য ও সুন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথ নৃত্যে নবরূপ ও নবরস সঞ্চারের একান্ত প্রয়াসী হইয়া কি অভিনব রূপে বিগত শতাব্দীর অস্পৃশ্য নৃত্যরূপকে কত শোভন কত মনোরম কত আবশ্যকীয় করিয়া গেলেন। নৃত্যকলা ও নাট্যকলা লইয়াও তাঁহার জীবনের বহুদিন কত সাধনায় কাটিয়াছে।

শৈশব হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে যৌবন, এবং যৌবন হইতে শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার লিখিত কাব্যগ্রন্থ গীতিনাট্য ও নাটক পাঠ করিলে ও তাঁহা দ্বারা প্রযোজিত ও অভিনীত গীতিনাট্য ও নাটক যাঁহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারাই মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারিবেন রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যেই সম্রাট ছিলেন না, অদ্বিতীয় নট-সম্রাট ও ছিলেন। এবং সুরে লয়ে তানে তিনি ছিলেন বর্ত্তমান যুগের তানসেন। সৌভাগ্য আমাদের, তাঁহার এই বহুমুখী বিরাট প্রতিভার সমসাময়িক দিনে আমরা তাঁহাকে কত রূপেই না দেখিলাম, তাঁহার সদালাপে কী তৃপ্তিই অনুভব করিলাম, তবুও অতৃপ্ত হইয়া রহিল অশান্ত মন শুধু এক চিন্তায় যে রবীন্দ্রনাথকে আর ইহজগতে দেখিতে পাইব না।

"বড় কায হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তে যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য।"

—বিবেকানন্দ

নৃত্যকলার যুগ প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ

শান্তিদেব ঘোষ

আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের নাম সর্ব্বাগ্রে না করে পারি না। একথা বল্লে একটুও অত্যুক্তি হবে না যে তিনি যদি প্রথম, প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে, এই কলাকে নিজ হাতে উৎসাহিত না করতেন তবে আজ আমরা দেশে নাচের বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠান, সংঘ, নর্ত্তক, নর্ত্তকীদের পরিচয় পেতাম কি না জানি না। এবং যে সম্মান আজ নাচিয়েদের আমরা দিচ্ছি সে সুবিধা এত সহজ হোতো কি না কে জানে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে নাচিয়ে নন, অথচ তিনি নাচের নবযুগ সূচনা করেছেন ভারতে। তৈরী করেছেন জনসাধারণের মন নানাভাবে বিরুদ্ধ মনোভাবের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে। তৈরী মাটিতে তখন বীজ পড়া মাত্র সুন্দর ফল ফলেছে দেখলাম এবং নাচিয়ে পেলাম, যারা আর মানলোনা সমাজের শাসন ও আদেশ। দেশে বিদেশে সম্মান সংগ্রহ করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করল।

তিনি দেশের এই মনোভাবকে নাচের অনুকূল পথে চালনা করলেন, তাঁরই রচিত শান্তিনিকেতনের সাহায্যে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শান্তিনিকেতন হোলো তাঁর আদর্শে চালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেখানে কেন তিনি নৃত্যকলার আয়োজন করলেন। তার কি কোন প্রয়োজন ছিল। নিশ্চয় ছিল। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হোলো সংস্কৃতিতে মানুষকে বড় করে তোলে। সেই মানুষ, সেই জাত, বা সেই দেশ, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হবে। যার ভিতরে সংস্কৃতির ছাপ আর সব জাত বা দেশের উপরে। সংস্কৃতির যে ক'টা বাহন আছে, তার মধ্যে নৃত্যকলাকে একটি প্রধান বাহন রূপে একদিন আমাদের দেশে ধরা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে আমাদের সমাজ জীবন থেকে একে আমরা রেহাই দিয়েছিলাম অনেক দিন। বিশেষত শিক্ষাভিমানী উচ্চ শ্রেণীর সমাজ থেকে। শিক্ষার প্রধান কর্ত্তব্য হোলো চিত্তকে নানা প্রকার শিল্প ও জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃতির পথে জাগ্রত করে তোলা। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকলাকে স্থান দিয়েছিলেন এই কথাই ভেবে। এখানকার নাচকে এবং তার আদর্শকে ঠিক ভাবে বুঝতে পারলে আমরা দেখতে পাবো

শান্তিনিকেতনে নাচের ব্যবস্থা দ্বারা কেবল নাচিয়ে তৈরী করা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও কলাবিদ্যা সমাজ-জীবনকে যেমন শান্তিময় করে তোলে, নৃত্যকলাও তাই করুক।

অপরিপক্ক, অনভ্যস্ত মন নিয়ে কাজ করা সহজ। সেই জন্য সর্ব্বদাই দেখি শিশুর অপরিণত মনেতে নূতন ভাবধারাকে চালাবার চেষ্টা। কারণ সেই বয়সে কোন চিন্তা যত সহজে ও গভীর ভাবে মনে বসে যায় পরিণত বয়সে তা হয় না। এর ফল রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতাবস্থায় দেখে যেতে পেরেছেন! শান্তিনিকেতনের এই ছাত্র ছাত্রীরা নাচে তৈরী হয়ে উঠে প্রথম আশ্রমে নাচের আবহাওয়া তৈরী করলো, তারপরে বিরুদ্ধ আবহাওয়া দূর করলো বাংলাদেশের, সর্ব্বশেষে সমগ্র ভারতের।

আগেই বলেছি নাচিয়ে তৈরী করা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু নাচের একটা standard রচনা করাই ছিল তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা। যা হবে আজকালকার শিক্ষিত মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন জনসাধারণের মনের খোরাক। এখন দেখা যাক তা তিনি পেয়েছেন কি না।

আমাদের সাহিত্যে আমরা দুটো ধারা দেখি, একটা হোলো জনসাধারণের বা অল্প লেখাপড়াজানিয়েদের সাহিত্য। এবং অপরটি হোলো শিক্ষিত মার্জ্জিত রুচি বিশিষ্ট জনসাধারণের সাহিত্য, যেটি গড়েছেন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। সাধারণের জন্য লেখা যে সাহিত্যের চল আমরা দেখি সাময়িক ভাবে তাদের কাছে তা সমাদর পায় বটে কিন্তু চিরকালের সাহিত্যে কি তাদের কোন স্থান আছে? চিরকালের সাহিত্যের জগতে স্থান পেয়েছে অপর দলের লেখা। ভবিষ্যতের সাহিত্য যদি কিছু উন্নতি করে তবে চিরকালের উপর ভর করেই করবে। জনসাধারণের কথা ভেবে লেখা সাহিত্যের কোন স্থান নাই সেখানে।

ছবির বেলায়ও তাই হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রচলিত চিত্রকলার ধারা হোলো চিরকালের। সাময়িক হোলো রবিবর্ম্মা ইত্যাদির ছবি। একদিন জনসাধারণের চিত্তকে সে যে ভাবে জয় করেছিলো তখন কেউ ভাবতে পারেনি যে ভবিষ্যতে যখন নব্য ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনা হবে তখন রবিবর্ম্মার ছবির কোন স্থান থাকবে না তাতে।

গানেও সেই কথা, রবীন্দ্র প্রচলিত সঙ্গীতের ধারা চিরকালের হয়ে রইলো, কিন্তু এই ধারার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য অতি প্রচলিত সঙ্গীতের ধারা আজ বাঙ্গালীর সঙ্গীতের জগতে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে নি। যেমন হিন্দী গানের অনুকরণে কিছুদিন আগেকার যাত্রা

গান, বাংলা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্‌পা, ঠুংরী ইত্যাদি। এক সময় এর প্রত্যেকটি ধারাই বাঙ্গালীর অন্তরে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিলো।

রবীন্দ্রনাথ নব্য ভারতীয় নৃত্যকলায় সেই রকমের একটি ধারা আমাদের বাৎলিয়ে গেছেন, যেটি হোলো চিরকালের। যার উপর নির্ভর ক'রে ভবিষ্যতের ভারতীয় নৃত্যকলা আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে পারবে। যদিও এ সত্যিকার মার্জ্জিত, শিক্ষিত মনের খোরাক বলে বৃহৎ জনসাধারণের মন আকর্ষণ করতে পারে নি।

আজ আমরা প্রাচীন দেব দেবীর ঘটনা, বর্ণনা ও সাজ পোষাক ইত্যাদির দ্বারা হুবহু বা অসমর্থ অনুকরণে নৃত্যকলার অনুষ্ঠান দেখে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আজ যদি কোন অতি বড় সাহিত্যিক গায়ের জোরে বলেন, যেহেতু সংস্কৃত আমাদের দেবভাষা, অতি প্রাচীন ভাষা, ও বিশাল সাহিত্য সম্পদ এতে আছে, সুতরাং আমাদের সেই ভাষায় আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করা উচিত—তাহলে তাকে বাতুল বললে কি আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ থাকতে পারে?

রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত নাচের মূল বৈশিষ্ট হোলো, সে মনেপ্রাণে খাঁটি ভারতীয় আদর্শের উপর গঠিত। ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের নিজস্ব যে বিশেষ ধারাটি বহু যুগ থেকে বয়ে এসেছে, এবং যে নৃত্যাভিনয় পদ্ধতি একদিন সমগ্র পূর্ব্ব দেশকে আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই আদর্শ থেকে তিনি একটুও বঞ্চিত হন নি। অথচ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে তাঁর রচনা প্রাচীন আদর্শের উপর দাঁড়িয়েও আধুনিক শিক্ষায় বৰ্দ্ধিত জনসাধারণের অতি উপযোগী হয়েছে। অন্যান্য শিল্পীরা আজ বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত নৃত্য পদ্ধতিকে স্বীকার করেনি, তারা প্রাচীন নৃত্য, লোক নৃত্য, ইত্যাদিকে খণ্ডিত ভাবে দর্শকের কাছে প্রকাশ করেছে। এই ভাবে প্রকাশ করার দরুণ সাজ সজ্জায় আকারে তা দেশী হয়েছে কিন্তু তাতে ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের আদর্শ বা রীতি ব্যাহত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গানকে নৃত্যাভিনয়ে বড় স্থান দিয়েছিলেন। সঙ্গীত ছিল ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যের একটী বিশেষ অঙ্গ। আজ কিন্তু অন্যেরা নানা যন্ত্রের ছন্দবহুল ধ্বনিকে অবলম্বন করলো নাচে। গানের একেবারেই কোন স্থান নেই সেখানে। অতি প্রচলিত ইয়োরোপের এক প্রকার নৃত্যের সঙ্গে জড়িত যন্ত্র সঙ্গীতের প্রভাবে আমরা গান বাদ দিয়ে যে ভাবে নাচের জন্যে যন্ত্র সঙ্গীত রচনা করছি, সে কাজে এখনো পর্য্যন্ত যে ছেলেমানুষ বড় হয়ে উঠেছে একথা না বলে পারা যায় না। যাভা, বালী, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান ইত্যাদি পূর্ব্বদেশে নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিরাট যন্ত্র সঙ্গীতের চলন আছে, যদিও সে যন্ত্রসঙ্গীত নাচের একটি বিশেষ অঙ্গ, তবু কোনখানেই কণ্ঠসঙ্গীতকে তারা বাদ দেয় নি। সব প্রাচীন নৃত্যনাট্য কণ্ঠ

সঙ্গীতের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অভিনয়ে গান হয় যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গে। কেবল মাত্র যন্ত্র সঙ্গীতের সাহায্যে নৃত্যাভিনয় প্রথা আমরা পেয়েছি সম্পূর্ণরূপে এই শতাব্দীর পাশ্চাত্য নৃত্যকলার প্রভাবে। এই দুই কারণেই আমি বলতে বাধ্য যে রবীন্দ্রনাথ নাচে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়, অপরেরা বাহিরে ভারতীয় কিন্তু ভিতরে তাদের মন আবৃত করে রেখেছে ইয়োরোপের নৃত্যাদর্শ।

পাশ্চাত্য নৃত্যে নর্ত্তক নর্ত্তকীর দেহকে বাদ দিয়ে সে কলার কোন স্থান হয় না দর্শকের কাছে। দর্শক দেখে ওস্তাদ নাচিয়ে কি রকম নাচলো। তাঁর দেহ কি রকম সুগঠিত। দেহের সৌন্দর্য্য, লালিত্য ইত্যাদি সেখানে খুবই বড় স্থান নেয়। তাই সেখানে যে নৃত্যের আয়োজন হয় তা প্রধানত নাচিয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে। ছোট বড় যে ভাবেই হোক, নানা প্রকার নাচের সমাবেশে আমরা সেই বিশেষ ব্যক্তিকেই সমস্ত কার্য্যসূচীর কেন্দ্রে দেখি। আমাদের দেশে সেই আবহাওয়াই বর্ত্তমানে প্রবল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যাভিনয়ে হোলো গল্পের ভাব ও তার রস প্রধান। সেখানে নাচিয়ের ব্যক্তিত্ব নাচকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনা। তাঁর রচনা কোন বিশেষ নাচিয়েকে কেন্দ্র করে রচিত নয়। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের আদর্শও ঠিক এই পথেই বয়ে এসেছে।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টির বড় পরিচয়। একদিকে তিনি প্রাচীন আদর্শে ভারতীয় নৃত্যযুগপ্রবর্ত্তক এবং তিনিই এদিকে সকলের চেয়ে অতি আধুনিক। তাঁর শেষ জীবনের নৃত্যনাট্যগুলি যে আগামী কালের নৃত্যনাট্যকে প্রেরণা দেবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর নৃত্যনাট্যের মধ্যে আমরা আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক সমাজের চিত্র পাইনা ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও দেখিনা। তাঁর রচনা চেয়েছে সমগ্র কালের মানব লোকের চিরন্তন সমস্যাকে সুন্দর করে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তুলে চিত্তকে উন্নততর রসলোকে উত্তীর্ণ করতে যা কোনদিন কারু কাছেই অবান্তর মনে হবে না। তাঁর রচনা কোন দল বা শ্রেণী বিশেষের সমস্যার সমাধান দেখতে চায়নি।

টেক্‌নিকের দিক থেকে আলোচনা করলে এই কথা বলতে পারি যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বাংলা চিত্রকলা, বাংলা সঙ্গীত যেভাবে আধুনিক মন-কে মুগ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যধারা সেই পথেই আছে। অতি প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতিকে অবিকল অনুকরণ করেন নি, আবার আধুনিক এক ধরণের পাশ্চাত্য নাচের আদর্শে বাস্তব-তাকেও তাঁর নাচে স্থান দেন নি। কিন্তু ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে যেখানে পাশ্চাত্য পদ্ধতি বৈচিত্র দানে সহায়তা করেছে, খাপ খেয়েছে, সেখানে তাকে অনায়াসে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্র নাথের শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে এই চেষ্টা যে কতটা কৃতকার্য্য হয়েছে কিছুদিন পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত তাঁর দ্বারা পরিচালিত নৃত্যনাট্যের অভিনয় সে সাক্ষ্য দিয়েছে। শান্তিনিকেতনে এই মিশ্রণ যতটুকু সুন্দর হয়ে উঠেছে অন্য কোথাও এতটা সম্ভব হয়নি। সমগ্র ভাবে নানা প্রকার ভারতীয় ও কিছু বিদেশী নাচের পদ্ধতি এক হয়ে গিয়ে একটি আশ্চর্য্য রকমের নূতনত্ব দান করেছে। অন্যরা সাধারণত বিভিন্ন নৃত্য পদ্ধতিকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ করার পক্ষপাতী। সেগুলি হোলো নৃত্যকলার প্রদর্শনী।

আজ হয়তো প্রশ্ন উঠবে ভবিষ্যতে আমাদের নৃত্যপদ্ধতি বা টেক্‌নিকের কোন্ পথ গ্রহণ করা উচিত। উত্তরে আজ যদি বলি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে যে আদর্শ প্রবর্ত্তন করে গেলেন, সেই হবে ভবিষ্যতের প্রেরণা। তাহলে হয়তো আজ অনেকে মনে করবেন এ অতিশয়োক্তি, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রাচীন পদ্ধতিকে অনুকরণ করে যে নাচ আজ চলেছে ভবিষ্যতে দেশের মন নৃত্যকলায় অগ্রসর হবে ততই এর প্রতি আগ্রহের অভাব প্রকাশ পাবে।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে এই অগ্রগতির পথে আজ যে বাধা পড়লো তা পূরণ করবার মত দেশে কেউ নেই। কিন্তু আমরা তাঁর কাছ থেকে সেই পথের নির্দ্দেশ পেয়েছি, এই আমাদের সান্ত্বনা। এখন এই পথে চলবার সামর্থ্য আমাদের আছে কিনা সেটাও আমরা বুঝতে পারবো ধীরে ধীরে।

"ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে শাস্ত্রাচার অপরিজ্ঞাত এবং অনভ্যস্ত; এই জন্য তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বশ্যভাবের ন্যূনতা এবং তাঁহাদের ব্যবহারে নম্রতার ত্রুটি জন্মিয়া যাইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের যে গুণগুলি আছে, সে গুলিও লোকের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হয়না এবং তাঁহারা সুখ্যাতি ভাজন হইতে পারেন না।"

—ভূদেব
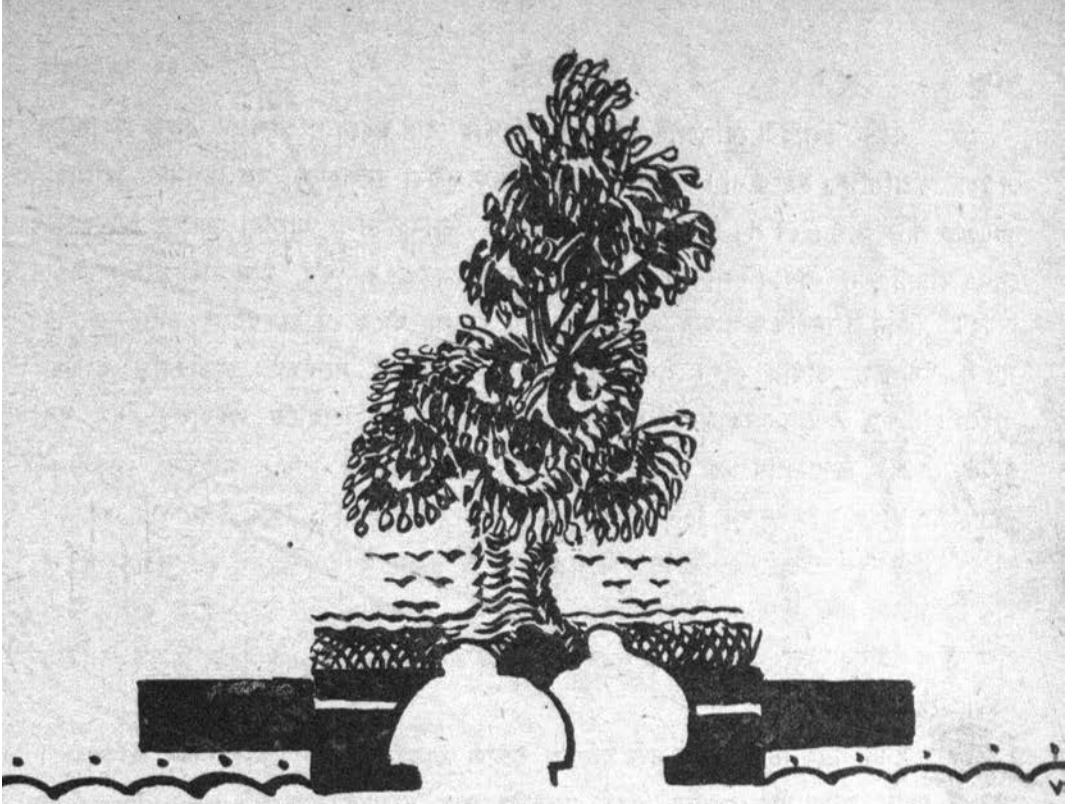
কলা–ভবন

দর্শক ও সমসাময়িক চিত্রকর

বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সমসাময়িক চিত্রকরদের ছবি দর্শক সাধারণত সহজে গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহার প্রধান কারণ এই যে সাধারণ দর্শক যে ধরণের ছবি দেখিতে অভ্যস্ত, সমসাময়িক চিত্রকরদের — বিশেষ করিয়া যে সকল চিত্রকর নূতন পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন তাঁহাদের ছবি সে ধরণের হয় না। তাহা ছাড়া মানুষ স্বভাবতই নূতন জিনিষ সম্বন্ধে সন্দিহান; সে পরিচিত পুরাতন জিনিষ লইয়া থাকিতেই ভালবাসে। তাই সম্পূর্ণ নূতন রকমের কোন ছবি সাধারণ দর্শকের সামনে ধরিলে তিনি তাঁহার পরিচিত জিনিষগুলি তাহাতে খুঁজিবার চেষ্টা করেন এবং হতাশ হইয়া বলেন, হয় চিত্রকর ছবি আঁকিতে জানেন না নতুবা ছবি বুঝিবার মত ক্ষমতা তাঁহার নাই। ছবি যে পরিমাণে আধুনিক হইবে সেই পরিমাণেই তাহাকে লইয়া গোলযোগ সৃষ্টি হইবে।

একটু তলাইয়া দেখিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার বোধ হইবে। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নদী সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, বহু উপনদী আসিয়া নদীটিতে পড়িতেছে; যে সব জায়গায় ঘোলা জল সহ উপনদীগুলি আসিয়া নদীতে পড়িয়াছে সেই জায়গাগুলি প্রথমে আমাদের নিকট কিছুটা অদ্ভুত লাগিবে, মনে নানা সন্দেহ দেখা দিবে। কোন উপনদীর জল যদি অপেক্ষাকৃত কম ঘোলা থাকে তাহা হইলে নদীর জলের সহিত মিশিতে তাহার বেশী সময় লাগিবে না, আমাদের সন্দেহও তাড়াতাড়ি কাটিয়া যাইবে। কিন্তু যে উপনদীর জল বেশী ঘোলা—বিপত্তি হইবে তাহাকে লইয়াই। যুগ যুগ ধরিয়া দেশের চিত্রকলার যে ধারা বহিয়া আসিতেছে, তাহার সহিত নদীটির এবং উপনদীগুলির সহিত নূতন নূতন চিত্রকরের তুলনা করিলে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে। অনেক চিত্রকরই তাঁহাদের নিজের নিজের যুগ অতিক্রম করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যান; তাঁহাদের ছবি তাঁহাদের সমসাময়িক দর্শকবৃন্দ অতিআধুনিক ও অর্থহীন আখ্যা দিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখেন। আবার পরবর্ত্তী যুগের দর্শকের কাছে এই সকল চিত্রকরই প্রিয় হইয়া উঠেন।

সমসাময়িক চিত্রকরদের ছবি বুঝিতে হইলে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। আমরা জানি চিত্রকলার জগতে একটি ক্রমবিকাশের ধারা চলিতেছে। এই ধারার মধ্যে দর্শক একটি স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন; গত যুগের ধারা তাঁহার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সেইখানেই শেষ হয় নাই, তাঁহাকে ছাড়াইয়া উহা ভবিষ্যতের দিকেও অগ্রসর হইয়াছে। তিনিই গত যুগের ধারার সহিত ভবিষ্যতের ধারার সংযোগ স্থাপন করেন। ক্রমবিকাশের ধারাটি যেখানে আসিয়া তাঁহার কাছে ঠেকিয়াছে সে পর্য্যন্ত তাঁহার বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার পরে উহা যখন বিরাট ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয় তখনই তিনি বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং সমসাময়িক চিত্রকর সম্বন্ধে নানা প্রকার অর্থহীন মন্তব্য করিতে থাকেন। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে সমসাময়িক চিত্রকর বলিতে যাঁহারা চিরাভ্যস্ত পন্থা বা অনুচিকীর্ষা বর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন, তাঁহাদের কথাই বুঝিতে হইবে।

চিত্রকলার ইতিহাসে চিত্রকরের দর্শনভঙ্গি স্থায়ী নয়, স্থায়ী হইলে চিত্রকলার নব নব উন্মেষ কখনই সম্ভব হইত না। অথচ দর্শক চিত্রকরের যে দর্শনভঙ্গিটির সহিত পরিচিত উহাকেই তিনি চরম বলিয়া গ্রহণ করেন, উহার বিচিত্র পরিবর্ত্তনের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা তিনি মানিতে পারেন না। সাধারণত দেখা যায় প্রতিভাবান চিত্রকরের দর্শনভঙ্গি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের চিত্রকরের দর্শনভঙ্গি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র; তিনি হয়ত নূতন